# মহাবিশ্ব ও পৃথিবী
# (The Universe and Earth)

**ইউনিট**
**২**

## ভূমিকা

ভূগোলের যে শাখা মহাবিশ্বে বিচরণরত জ্যোতিষ্কমন্ডলী. সৌরজগত ও বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহ সমূহ, গ্রহাণুপুঞ্জ, উল্কা, ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করে, তাকে গাণিতিক ভূগোল বলে। এই ইউনিটে আমরা গাণিতিক ভূগোলের অন্যতম বিষয় মহাবিশ্ব ও পৃথিবী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব।

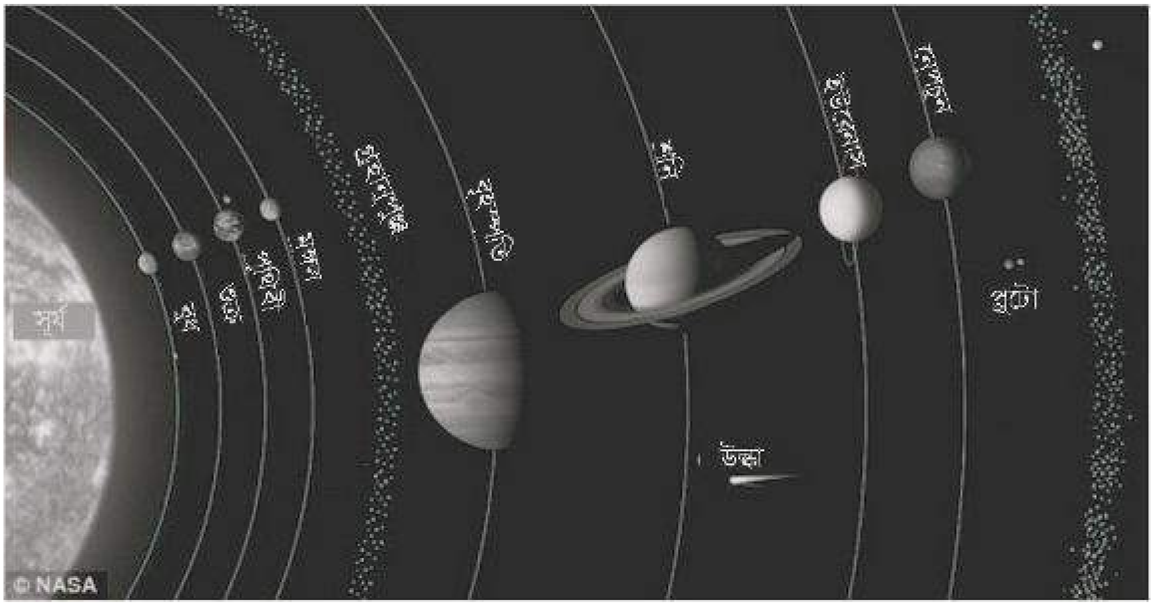


| | |
|---|---|
| ইউনিট সমাপ্তির সময় | ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ |

**এই ইউনিটের পাঠসমূহ**

পাঠ - ২.১ : মহাবিশ্ব, জ্যোতিষ্কমন্ডলী ও সৌরজগৎ
পাঠ - ২.২ : পৃথিবী ও এর আকৃতি
পাঠ - ২.৩ : অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা রেখা
পাঠ - ২.৪ : আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা ও সময়
পাঠ - ২.৫ : পৃথিবীর গতি : আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি

# পাঠ-২.১ মহাবিশ্ব, জ্যোতিষ্কমন্ডলী ও সৌরজগৎ
## (The Universe, Luminaries and the Solar System)

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- মহাবিশ্ব বলতে কী বুঝায় তা জানতে পারবেন;
- জ্যোতিষ্কমন্ডলী বলতে কী বুঝায় ও এদের প্রকারভেদ সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- সৌরজগৎ ও এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং
- সৌরজগতের উল্লেখযোগ্য গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহাণুপুঞ্জ  ও উল্কা পিন্ড সম্পর্কে জানতে পারবেন ।

| | | |
|---|---|---|
| | **মূখ্য শব্দ** | জ্যোতিষ্কমন্ডলী, গ্যালাক্সী, গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহাণুপুঞ্জ  ও উল্কাপিন্ড। |

### মহাবিশ্ব ও জ্যোতিষ্কমন্ডলী

সৃষ্টি জগতের সকল উপাদানকে একত্রে মহাবিশ্ব বলা হয়। মহাকাশে বিরাজমান সকল নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ, গ্যালাক্সি, ছায়াপথ, উল্কা, ধূমকেতু এবং জৈব ও অজৈব জগতের সকল মহাজাগতিক পদার্থ সমূহকে ব্যাপক অর্থে 'জ্যোতিষ্ক' বলে। সূর্য একটি জ্যোতিষ্ক।

**সৌরজগতের সংজ্ঞা :** মহাকাশে মাঝারী এক নক্ষত্র হলো সূর্য। সূর্যের মহাকর্ষ শক্তির (Gravitational Force) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে,একে কেন্দ্র করে বিভিন্ন আকারের গ্রহ-উপগ্রহ, গ্রহাণুপুঞ্জ ও উল্কাসমূহ একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে ও নির্দিষ্ট গতিতে অনবরত ঘুর্ণনরত অবস্থায় বিরাজ করছে। সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুর্ণনরত অবস্থায় সকল গ্রহ-উপগ্রহ, গ্রহানুপুঞ্জ ও উল্কাপিন্ডের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে আমাদের সৌরজগৎ (চিত্র ২.১.১)।

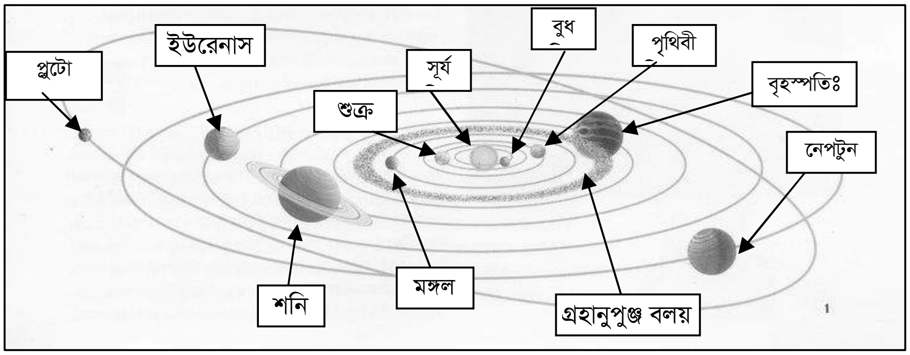


চিত্র ২.১.১ : সৌরজগৎ

**সৌরজগতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :** সৌরজগতের কেন্দ্রে অবস্থিত সূর্যের প্রবল মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে মোট নয়টি (বর্তমানে ১২টি) বিভিন্ন আকারের গ্রহ (Planet) একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে, ডিম্বাকৃতির একটি পথে ক্রমাগত আবর্তিত হচ্ছে। এই পথটি **কক্ষপথ** নামে পরিচিত। আবার গ্রহসমূহকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকারের কিছু গোলাকার বস্তু, যা উপগ্রহ (Satellite) পরিচিত। যেমন ঃ পৃথিবী নামক গ্রহটিকে ঘিরে আবর্তিত হয় চাঁদ নামক উপগ্রহ। আমাদের সৌরজগতের মোট গ্রহের সংখ্যা পূর্বে নয়টি মনে করা হলেও, অতি সম্প্রতি নতুন আরও তিনটি গ্রহ আবিষ্কৃত হওয়ায় বর্তমানে মোট গ্রহের সংখ্যা ১২টি (যথা : বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো, ভলকান, এক্স-১ ও এক্স-২)। এছাড়া মোট উপগ্রহের সংখ্যা ৬৩টি (মতান্তরে ৬৮টি) এবং প্রায় এক কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট গ্রহাণু সংখ্যা প্রায় ১৭০০টি। সূর্য থেকে প্লুটো গ্রহ পর্যন্ত দূরত্ব ৫৯০ কোটি কিলোমিটার। বুধ সূর্যের নিকটতম ও প্লুটো দূরতম গ্রহ। মঙ্গল ও বৃহস্পতি নামক গ্রহ দুইটির কক্ষপথের মাঝামাঝি অবস্থানে রয়েছে এক কিলোমিটার বা তার চেয়ে ক্ষুদ্রায়তনের হাজার হাজার **গ্রহাণু** (asteroids), লক্ষ লক্ষ **ধূমকেতু** (Comet), **উল্কা ও উল্কাপিন্ড** (Meteoroids),সুক্ষ্ম ধূলিকণা ও বিভিন্ন ধরনের গ্যাসীয় পদার্থসমূহের এক বলয়, যা গ্রহানুপুঞ্জ বলয় নামে অভিহিত।

**মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সী ও সৌরজগত (Milkyway Galaxy & Solar System):** সুদূর আকাশে বায়বীয় পদার্থ ও গ্যাসপূর্ণ স্বল্পালোকিত মেঘের মত আস্তরণকে গ্যালাক্সি বলা হয়। আমাদের সৌরজগত মিল্কিওয়ে (Milkyway) গ্যালাক্সির ক্ষুদ্র অংশবিশেষ, যা বাংলায় ছায়াপথ নামে অভিহিত। এই ছায়াপথটি অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্রের সমন্বয়ে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত।

**সৌরজগতের উল্লেখযোগ্য গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহাণুপুঞ্জ ও উল্কাসমূহ**

**পৃথিবী (Earth) :** আমাদের সৌরজগতের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রহ হলো- আমাদের বাসস্থান ‘পৃথিবী’। এটি সৌরজগতের মাঝারী আকারের একটি গ্রহ (গড় ব্যস হলো ১২,৭৩৪.৫ কিঃ মিঃ প্রায়)। পৃথিবী নিজ কক্ষপথটি ডিম্বাকৃতির ও মোট ৩৬৫ দিন ৫ ঘন্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড বা এক বছরে সূর্যকে প্রদক্ষিন করে থাকে। পৃথিবী নিজ অক্ষে ২৩ ঘন্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেন্ড বা এক দিনে আর্বতন করে (চিত্র ২.১.২)। পৃথিবীর একটি মাত্র উপগ্রহ হলো **চন্দ্র**। সৌরজগতের সকল গ্রহের মধ্যে কেবল পৃথিবী জীব ও উদ্ভিদের বসবাস উপযোগী গ্রহ।

**চন্দ্র (Moon) :** চন্দ্র পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ। প্রায় ৩৭.৯ মিলিয়ন বর্গ কিঃ মিঃ আয়তন বিশিষ্ট চন্দ্র মোট ২৯ দিন ১২ ঘন্টা ৪৪ মিনিট বা এক চন্দ্র মাসে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। চন্দ্রের নিজস্ব কোনো আলো নাই, সূর্যের আলোকে এটি আলোকিত হয়। এই আলো বিচ্ছুরিত হয়ে পৃথিবীকে রাতের বেলা আলো দেয় (চিত্র ২.১.৩)।

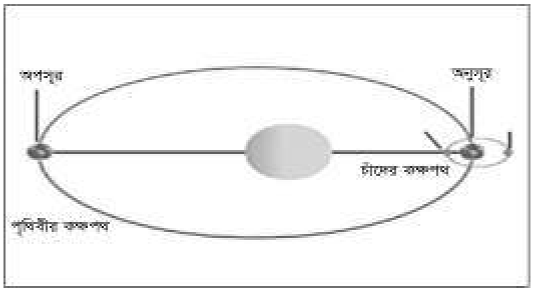


চিত্র ২.১.২ ঃ পৃথিবী নিজ অক্ষে ও কক্ষপথে আবর্তন করে

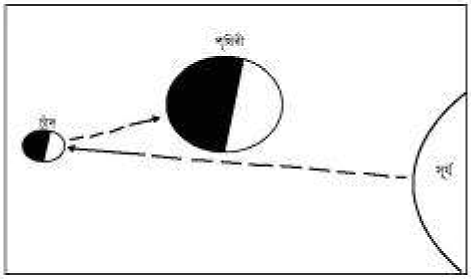


চিত্র ২.১.৩ ঃ সূর্যের আলোকে আলোকিত চন্দ্রের আলো বিচ্ছুরিত হয়ে পৃথিবী আলোকিত হয়।

**বৃহস্পতি (Jupiter) :** সৌরজগতের সর্ববৃহৎ গ্রহ হলো ‘বৃহস্পতি’ একটি গ্যাসীয় গোলক। আয়তনে পৃথিবীর প্রায় ১৩ গুণ বৃহদাকার এই গ্রহ ‘গ্রহরাজ’ নামে অভিহিত। বৃহস্পতি গ্রহের এখন পর্যন্ত মোট ৬৪ টি উপগ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে।

**শনি (Saturn) :** সৌরজগতের অন্যতম বিশালাকার গ্রহ শনির ৭টি উজ্জ্বল বলয় এবং ৬২ টি উপগ্রহ রয়েছে। প্রায় ১,২০,০০০ কি.মি. ব্যাস বিশিষ্ট বরফাচ্ছাদিত এই গ্রহটি সূর্য থেকে মোট ১,৪৩৯ কি.মি. দূরত্বে অবস্থিত।

**প্লুটো (Pluto) ঃ** প্লুটো সৌরজগতের ক্ষুদ্রতম ও নবম উপগ্রহ। উপবৃত্তাকার কক্ষপথে প্লুটো সূর্যকে প্রদক্ষিন করে। চেরন প্লুটোর একমাত্র উপগ্রহ। সূর্য থেকে এর দূরত্ব প্রায় ৫,৯০০ কি.মি.।

চিত্র ২.১.৪ ঃ গ্রহানুপুঞ্জ বলয়

**গ্রহাণুপুঞ্জ (Asteroids) :** সৌরজগতে মঙ্গল (Mars) ও বৃহস্পতি (Jupiter) এই দুইটি গ্রহের মধ্যবর্তী অংশে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ (১.৬-৮০৫ বর্গ কিঃ মিঃ আয়তন বিশিষ্ট) একত্রে পূঞ্জীভূত হয়ে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে।এগুলোকে একত্রে গ্রহানুপুঞ্জ বলে। গ্রহানুপুঞ্জ সমূহ একটি বলয়ের মতো ঘিরে থাকে, যা গ্রহানুপুঞ্জ বলয় নামে অভিহিত (চিত্র ২.১.৪)।

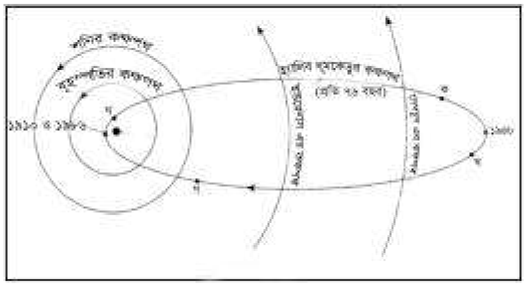

চিত্র ২.১.৫ : হ্যালির ধূমকেতু

**ধূমকেতু (Comet) ঃ** ধূমকেতু এক ধরনের জ্যোতিষ্ক। ধূমকেতুর দুইটি অংশ রয়েছে যেমন : মস্তক (Head) বা কেন্দ্র ও পুচ্ছ (Tail)। কোনো কোনো ধূমকেতুর মস্তক বা কেন্দ্র গ্রহ অপেক্ষা বড় হয়ে

থাকে। ধূমকেতুর রয়েছে গ্যাসীয় পদার্থের তৈরি সুদীর্ঘ পুচ্ছ। অধিকাংশ ধূমকেতু উপবৃত্তাকার কক্ষপথে গ্রহসমূহের আবর্তন পথের উল্টোদিকে ছুটে চলে। হ্যালির ধূমকেতু (Hally's Comet) প্রতি ৭৬ বছর অন্তর পৃথিবীর আকাশে দৃষ্টিগোচরীভূত হয় (চিত্র : ২.১.৫)।

**উল্কা ও উল্কাপিন্ড (Meteors & Meteoroids) :** উল্কা মহাশূন্যে বিচরণরত ক্ষুদ্রাকৃতি বিশিষ্ট কঠিন বস্তু। ক্ষুদ্রায়তনের এই উল্কাপিন্ড একত্রে পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করে বাতাসের সাথে সংঘর্ষে প্রজ্জ্বলিত হয়ে তুষারপাতের মতো ঝরে পড়তে থাকে। একে **উল্কাবৃষ্টি** বলে। উল্কা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে পৃথিবী পৃষ্ঠে পতিত হলে, তাকে উল্কাপিন্ড বলে। ১৯০৮ সালে সাইবেরিয়ায় পতিত উল্কাপিন্ডর আঘাতে বনভূমির ব্যাপক এলাকা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

| **শিক্ষার্থীর কাজ** | নীচের সৌরজগতের চিত্রটিতে সূর্য, গ্রহ, গ্রহাণুপুঞ্জের কক্ষপথ চিহ্নিত করুন। |
|---|---|

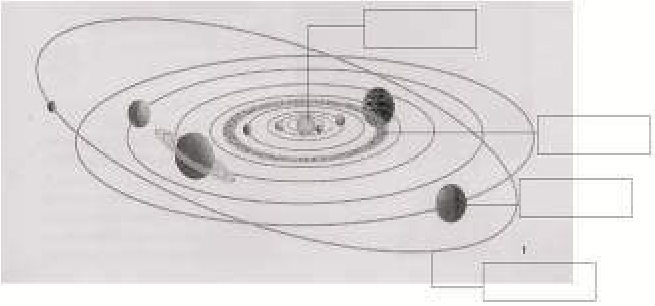

### সারসংক্ষেপ :

মহাবিশ্বে সদা সঞ্চারণশীল সকল পদার্থের সমন্বয়কে জ্যোতিষ্কমন্ডলী বলা হয়। যে সকল জ্যোতিষ্কের নিজস্ব আলো আছে তাদেরকে নক্ষত্র বলা হয়। অপরদিকে, আলোবিহীন জ্যোতিষ্ককে গ্রহ বলা হয়। সুদূর আকাশে গ্যাসীয় পদাথ, ধূলিকণা ও অন্যান্য বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত স্বল্পালোকিত মেঘের মত আস্তরণকে গ্যালাক্সি বলা হয়। পৃথিবী থেকে দৃশ্যমান মহাশূন্যে বিচরণরত অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্রের সমন্বয়ে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত তারকামন্ডলীকে ছায়াপথ বলে। রাতের আকাশে স্বল্পকালের জন্য দৃশ্যমান দীর্ঘ লেজ বিশিষ্ট জ্যোতিষ্ক সমূহকে ধূমকেতু বলা হয়। সূর্যকে প্রদক্ষিণরত অতি ক্ষুদ্র কঠিন পদার্থসমূহ উল্কা নামে পরিচিত।

### পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।**

১। আমাদের গ্রহ কোনো নক্ষত্রটিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়?
(ক) চন্দ্র (খ) বৃহস্পতি (গ) সূর্য (ঘ) শনি

২। কোনো গ্রহটি 'গ্রহরাজ' নামে অভিহিত করা হয়?
(ক) বুধ (খ) শুক্র (গ) মঙ্গল ঘ) বৃহস্পতি

৩। কোনো ধূমকেতু প্রতি ৭৬ বছর অন্তর পৃথিবীর আকাশে দৃষ্টি গোচরীভূত হয়?
(ক) হ্যালির ধূমকেতু (খ) হেইল-বপ (গ) লেক্সেল (ঘ) কোহুটেক

৪। গ্যালাক্সির অংশ বিশেষ কি নামে পরিচিত?
(ক) জ্যোতিষ্ক (খ) নীহারিকা (গ) ধূমকেতু (ঘ) ছায়াপথ

৫। মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের কক্ষপথ দুইটির মাঝামাঝি অবস্থানে কোনো ধরনের বস্তু রয়েছে?
(ক) গ্রহাণুপুঞ্জ (খ) উল্কা (গ) ধূমকেতু (ঘ) নক্ষত্র

# পাঠ-২.২ পৃথিবী ও এর আকৃতি (Earth & Its Shape)

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- পৃথিবীর আকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- পৃথিবীর আকৃতি নিরূপনের ক্ষেত্রে যুক্তি প্রদর্শন করতে পারবেন এবং
- পৃথিবীর আয়তন, পরিধি, ব্যাস ও ব্যাসার্ধ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

| | | |
|---|---|---|
| | **মূখ্য শব্দ** | পৃথিবীর আকার, আয়তন, পরিধি ও ব্যাস। |

### পৃথিবীর আকার/আকৃতি

আমাদের বাসস্থান পৃথিবী একটি গোলক, যা দেখতে অনেকটা কমলা লেবুর ন্যায়। পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরু খানিকটা চাপা ও বিষুব রেখা বরাবর কিছুটা স্ফীত। খৃষ্টপূর্ব ২৫০ সালে জ্যোর্তিবিদ ইরাটোসথেনীস পৃথিবীকে জ্যামিতিক নিয়মে পরিমাপ করে পৃথিবীর গোলাকৃতির প্রমাণ দেন। নিম্নে পৃথিবীর গোলাকৃতির প্রমাণের কতিপয় সহজ উপায় উপস্থাপন করা হলো।

### পৃথিবীর গোলাকৃতির প্রমাণসমূহ

পৃথিবীর গোলাকৃতির প্রমাণ নিম্নোক্ত কয়েকটি সহজ উপায়ে করা যায়। যেমন:

**ক. দূরবীন যন্ত্রের সাহায্যে :** দূরবীন যন্ত্রের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করে বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন যে, মহাবিশ্বের অন্যান্য জ্যোতিষ্কমন্ডলীর ন্যায় পৃথিবীও গোলাকার।

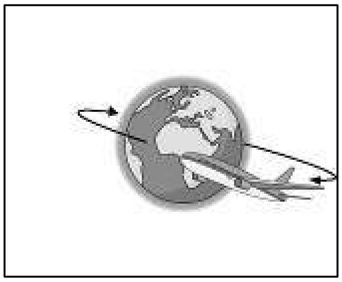

চিত্র ২.২.১ : জাহাজ বা প্লেনের একই দিকে যাত্রা

**খ. একই দিকে যাত্রা করে :** পৃথিবীর যে কোনো স্থান থেকে জাহাজে বা প্লেনে যাত্রা করে একই দিকে ক্রমাগত চলতে থাকলে পুনরায় ঐ স্থানে এসে পৌঁছান সম্ভব। বিখ্যাত নাবিক ম্যাগেলান, ড্রেক ও কুক একই দিকে ক্রমাগত জাহাজ পরিচালনা করে পুনরায় পূর্বের যাত্রাস্থানে ফিরে এসেছিলেন। পৃথিবীর গোলাকার না হলে অন্য কোনো স্থানের তাঁদের যাত্রা শেষ হতো (চিত্র ২.২.১)।

চিত্র নং ২.২.২: চন্দ্রগ্রহণের সময়ে চন্দ্রে পতিত পৃথিবীর ছায়া

**গ. চন্দ্র গ্রহণের সাহায্যে :** চন্দ্র গ্রহণের সময়ে পৃথিবী, সূর্য ও চন্দ্রের মাঝামাঝি অবস্থান করে। এই সময়ে পৃথিবীর যে ছায়া চন্দ্রের উপর পড়ে তা গোলাকার আকৃতির দেখা যায় (চিত্র ২.২.২)। পৃথিবী গোলাকৃতির না হলে এই ছায়া গোলাকার হতো না ।

**ঘ. দিগন্ত রেখার সাহায্যে :** বিশাল খোলা মাঠে বা সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে চারিদিকে তাকালে মনে হয় আকাশ ও ভূ-পৃষ্ঠ (পৃথিবীর উপরিভাগ) একটি বৃত্তাকার রেখায় মিশে গেছে। এ বৃত্ত রেখার নাম দিগন্তরেখা। পর্বতের উপরে বা প্লেনে যত উপরে উঠা যায়, ততই দিগন্ত রেখার পরিধি বৃদ্ধি পেলেও এর আকার বৃত্তাকার থাকে (চিত্র ২.২.৩)। পৃথিবী গোলাকৃতির না হলে এরূপ হতো না।

চিত্র নং ২.২.৩: বিভিন্ন উচ্চতা থেকে বৃত্তাকার দিগন্ত রেখা

**ঙ. জাহাজে যাত্রার সাহায্যে :** দূর হতে তীরের দিতে আসতে থাকা কোনো জাহাজের সম্পূর্ণ অংশ একবারে দৃষ্টিগোচরীভূত হয় না। প্রথমে জাহাজের মাস্তুল, পরে চোঙ, ডেক, ছাদ ও নিম্নভাগসহ সম্পূর্ণ জাহাজটি দেখা যায়।

পৃথিবী গোল হওয়ায় এরূপ হয় (চিত্র ২.২.৪)। পৃথিবী সমতল হলে সম্পূর্ণ জাহাজ একবারে দেখা যেত।

**(চ) সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়:** পৃথিবী গোলাকার বলে এর পূর্ব দিকের দেশগুলোতে প্রথমে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয়ে থাকে এবং পরবর্তীতে ক্রমশ পশ্চিমের দেশগুলোতে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয়। পৃথিবী সমতল হলে সকল দেশে একই সময়ে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত সংঘটিত হতো ( চিত্র ২.২.৫ )।

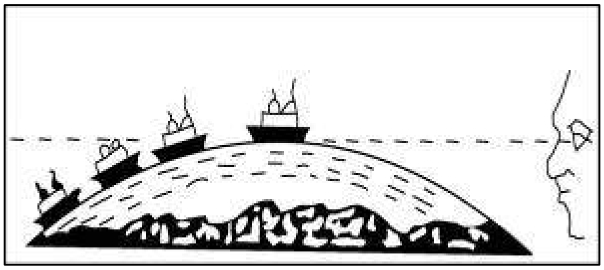

চিত্র ২.২.৪ : জাহাজে যাত্রার সাহায্যে

**(ছ) কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে:** আধুনিক কালে মহাকাশে স্থাপিত কৃত্রিম উপগ্রহ সমূহ (Satellites) থেকে প্রেরিত মহাকাশে বিচরণরত বিভিন্ন গ্রহ, উপগ্রহের আলোকচিত্র (Photograph) দেখে ধারণা করা যায় যে, অন্যান্য গ্রহের ন্যায় পৃথিবীর আকার গোলাকৃতি। অর্থাৎ, পৃথিবী একটি অভিগত গোলক (চিত্র ২.২.৬) ।

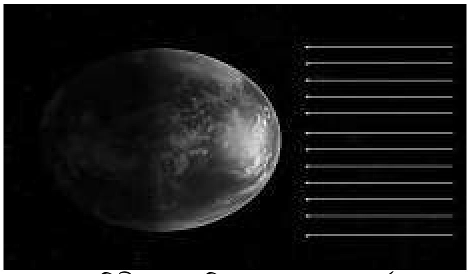

চিত্র ২.২.৫ : পৃথিবী গোলাকৃতির হওয়ায় প্রথমে পূর্বাংশে ও পরে পশ্চিমাংশে সূর্যোদয় দেখা যাচ্ছে

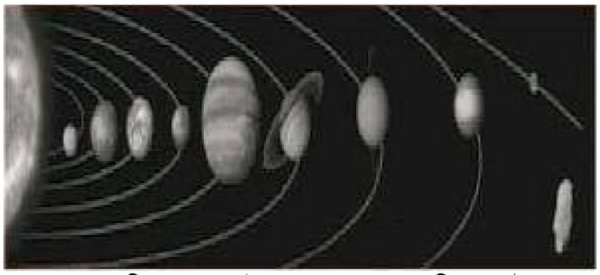

চিত্র ২.২.৬ ঃ সৌরজগতের গোলাকৃতির গ্রহ-উপগ্রহ

**পৃথিবীর আয়তন, পরিধি ও ব্যাস :** বিজ্ঞানীদের মতে, পৃথিবীর আয়তন ৫১ কোটি ৪৯ লক্ষ ২৫ হাজার ৭১৪.৩ বর্গ কিঃমিঃ। যে কোনো গোলাকের আয়তন পরিমাপের একটি গাণিতিক সূত্র রয়েছে। পৃথিবী একটি গোলক। সেক্ষেত্রে পৃথিবীর আয়তন পরিমাপের গাণিতিক সূত্র হলোঃ

পৃথিবীর আয়তন = ৪ x π x (ব্যাসার্ধ)$^2$

অর্থাৎ ,পৃথিবীর আয়তন = ৪ × ২২ ⁄ ৭ × (৬,৪০০)$^2$ বর্গ কি.মি.

= ৪ × ২২ × ৪,০৯,৬০০০/৭ বর্গ কি.মি.

= ৩৬,০৪৪,৮০,০০০/৭ বর্গ কি.মি.

= ৫১,৪৯,২৫,৭১৪.৩ বর্গ কি.মি.

অর্থাৎ , পৃথিবীর আয়তন ৫১ কোটি ৪৯ লক্ষ ২৫ হাজার ৭১৪.৩ বর্গ কি.মি. ।

**পৃথিবীর পরিধি:** গ্রীক পন্ডিত ইরাটোসথেনীস খৃস্টপূর্ব ২৫০ অব্দে গাণিতিক পদ্ধতিতে পৃথিবীর পরিধি নির্ণয় করেন। পৃথিবীর ঠিক মধ্যভাগ বরাবর অবস্থিত নিরক্ষরেখার (০$^\circ$ অক্ষাংশ) পরিধি হলো পৃথিবীর পরিধি। পৃথিবীর প্রকৃত পরিধি প্রায় ৪০,০০০ কিঃ মিঃ বা ২৫,০০০ মাইল। পৃথিবীর গড় ব্যাস প্রায় ১২,৭৩৪.৫ কি.মি. । মনে রাখবেন, পরিধি (Circumference) হলো, একটি বৃত্তের চারিদিকের পরিমাপ।

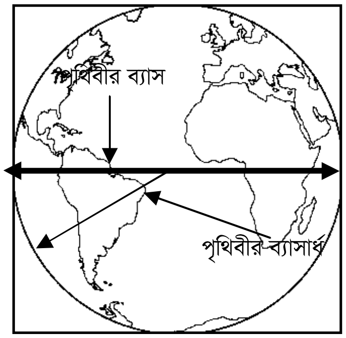


চিত্র ২.২.৭ : পৃথিবীর ব্যাস ও ব্যাসার্ধ

**পৃথিবীর ব্যাস (Diameter) ও ব্যাসার্ধ (Radius):** পৃথিবীর কেন্দ্র বিন্দুকে ছেদ করে একটি রেখা যদি পৃথিবীর যে কোনো দুইটি প্রান্তকে স্পর্শ করে, তবে ঐ রেখাকে পৃথিবীর ব্যাস বলা হয়। ইরাটোসথেনীসের গণনা অনুযায়ী-মেরুদেশীয় এলাকায় পৃথিবীর ব্যাস ১২,৭১৪ কি.মি. বা ৭,৯০০ মাইল এবং নিরক্ষরেখা বরাবর পৃথিবীর ব্যাস ১২,৭৫৭ কি.মি. বা ৭,৯২৭ মাইল। অপরদিকে, ব্যাসার্ধ (Radius) হলো, এমন একটি রেখা বা লাইন যেটি পৃথিবীর কেন্দ্র বিন্দু থেকে যে কোনো একটি প্রান্ত স্পর্শ করে। পৃথিবীর গড় ব্যাসার্ধ হলো ৬,৪০০ কিঃ.মিঃ. (চিত্র ২.২.৭)।

| শিক্ষার্থীর কাজ | ভূ-গোলকের সাহায্যে পৃথিবীর পরিধি, ব্যাস ও ব্যাসার্ধ কি উপায়ে পরিমাপ করা যায় ব্যাখ্যা করুন। |
|---|---|

**সারসংক্ষেপ :**

পৃথিবী একটি অভিগত গোলক। অর্থাৎ এর উত্তর ও দক্ষিণ অংশ কিছুটা চাপা ও মধ্যভাগ, অর্থাৎ নিরক্ষরেখা বরাবর অঞ্চলটি কিঞ্চিত স্ফীত। সৌরজগত পরিবারের মাঝারী আকারের গ্রহ পৃথিবীর পরিধি প্রায় ৪০,০০০ কিঃ মিঃ। পৃথিবীর গড় ব্যাস ১২,৭৩৪.৫ কি.মি. (প্রায়)। পৃথিবীর গোলাকৃতি আকার সম্পর্কে নানা প্রমাণ উপস্থাপন করা যায়। তবে আধুনিক মহাকাশ চিত্রসমূহ থেকে পৃথিবীর আকার সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.২

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।**

১. খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০ সালে কোনো জ্যোতির্বিদ পৃথিবীকে জ্যামিতিক নিয়মে পরিমাপ করেন?
   (ক) আর্কিমিডিস (খ) ইরাটোসথেনীস
   (গ) গ্যালিলিও (ঘ) প্ল্যাটো

২. বিশাল খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে চারিদিকে তাকালে দিগন্তরেখার আকৃতি কীরূপ দেখা যায়?
   (ক) বৃত্তাকার (খ) সরলরেখার ন্যায়
   (গ) চ্যাপ্টাকৃতির (ঘ) উপবৃত্তাকার

৩. একটি বৃত্তের চারিদিকের পরিমাপকে কী নামে অভিহিত করা হয়?
   (ক) আয়তন (খ) ব্যাসার্ধ
   (গ) পরিধি (ঘ) কৌণিক দূরত্ব

৪. পৃথিবীর পরিধি কত মাইল?
   (ক) ২০০০০ মাইল (খ) ৩০০০০ মাইল
   (গ) ২২০০০ মাইল (ঘ) ২৫০০০ মাইল

৫. পৃথিবীর আকার কীরূপ?
   (ক) অভিগত গোলকের ন্যায় (খ) সম্পূর্ণ গোলাকার
   (গ) চ্যাপ্টা আকৃতির (ঘ) ডিম্বাকৃতির

# পাঠ-২.৩ অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা রেখা (Latitudes & Longitudes)

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- পৃথিবীর অক্ষরেখা ও মেরুরেখার সংজ্ঞা প্রদান করতে পারবেন;
- অক্ষরেখা, অক্ষাংশ ও গুরুত্বপুর্ণ অক্ষরেখাসমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং
- দ্রাঘিমারেখা, দ্রাঘিমাংশ ও গুরুত্বপূর্ণ দ্রাঘিমা রেখা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

| | | |
|---|---|---|
| | **মূখ্য শব্দ** | অক্ষ, অক্ষরেখা, অক্ষাংশ, দ্রাঘিমা রেখা, দ্রাঘিমাংশ, নিরক্ষরেখা, কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তি রেখা, সুমেরুবৃত্ত ও কুমেরুবৃত্ত, আর্ন্তজাতিক তারিখ রেখা। |

**অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা রেখা**

পৃথিবী পৃষ্ঠে একটি নির্দিষ্ট স্থানের সঠিক (Absolute) অবস্থান ও উক্ত স্থানের সঠিক সময় জানবার জন্যে ভূ-বিজ্ঞানীগণ সমগ্র পৃথিবীকে মোট দুই ধরনের রেখা দ্বারা বিভক্ত করেছেন। এই রেখাসমূহ **অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা রেখা** নামে পরিচিত।

**পৃথিবীর অক্ষ ও মেরুদ্বয় (Axis & Poles of Earth)**

চিত্র ২.৩.১ : পৃথিবীর অক্ষ ও মেরুদ্বয়

পৃথিবী সৌরজগতে অভিগত গোলক আকৃতির মাঝারি একটি গ্রহ। পৃথিবীর উত্তর বা দক্ষিণ দিক দিয়ে কাল্পনিক একটি শলাকা প্রবেশ করিয়ে পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু ছেদ করে অপর প্রান্তে ঠিক নীচের দিকে বের করা হয়। উক্ত কাল্পনিক শলাকাটি পৃথিবীর অক্ষরেখা (Axis) এবং ঐ শলাকাটির উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত যথাক্রমে উত্তর মেরু (North Pole) ও দক্ষিণ মেরু (South Pole) হিসেবে পরিচিত (চিত্র ২.৩.১)।

**অক্ষরেখা, অক্ষাংশ ও গুরুত্বপূর্ণ অক্ষরেখা (Latitudes)**

ভূ-পৃষ্ঠের যে কোনো স্থানে নিরক্ষরেখার সাথে পৃথিবীর কেন্দ্র বিন্দুতে সৃষ্ট কৌণিক দূরত্বকে অক্ষাংশ বলে এবং যে কাল্পনিক রেখার মাধ্যমে একে প্রকাশ করা হয়, তাকে অক্ষরেখা বলে। পৃথিবীকে উত্তর-দক্ষিণে সমভাবে দুইভাগে বিভক্তকারী বৃত্তাকার রেখাটি নিরক্ষরেখা বা বিষুবরেখা নামে অভিহিত। এটি সর্ববৃহৎ অক্ষাংশ রেখা। নিরক্ষরেখার (০°) উত্তর ও দক্ষিণে এই অক্ষরেখা সমূহের আকার ক্রমশ ছোট হতে হতে দুই মেরুতে একেবারে বিন্দুতে পরিনত হয় (চিত্র ২.৩.২)।

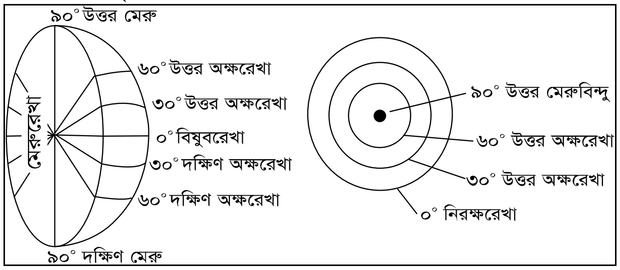


চিত্র ২.৩.২ : পৃথিবীর অক্ষ ও মেরুদ্বয়

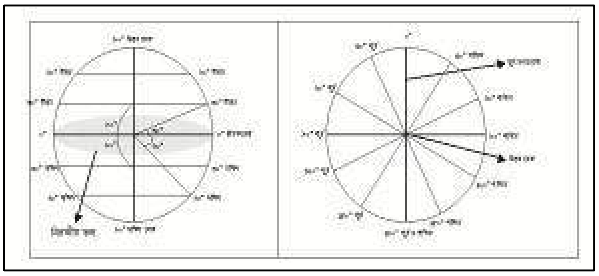

চিত্র ২.৩.৩ : নিরক্ষরেখা থেকে কৌণিক দূরত্ব,নিরক্ষীয় তল,মূলমধ্যরেখা

অর্থাৎ অক্ষরেখাগুলো নিরক্ষরেখার (Equator) সাথে কৌণিক দুরত্বে কল্পিত কতিপয় সমাক্ষরেখা (সমদূরত্বে অবস্থিত রেখা)। ২৩.৫° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষরেখাসমূহ যথাক্রমে **কর্কটক্রান্তি রেখা** ও **মকর ক্রান্তি** রেখা নামে অভিহিত হয়। ৬৬.৫° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষরেখাসমূহ যথাক্রমে **সুমেরু বৃত্ত** ও **কুমেরু বৃত্ত** নামে অভিহিত হয়।

**অক্ষাংশ নির্ণয় পদ্ধতি**

ভূপৃষ্ঠে কোনো একটি স্থানের প্রকৃত দূরত্ব জানতে হলে এর অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ নির্ণয় করা প্রয়োজন। অক্ষাংশ নির্ণয় করতে হলে, পৃথিবীর অভ্যন্তরে ঠিক মধ্যবিন্দু অর্থাৎ কেন্দ্র থেকে উক্ত স্থানটির কৌণিক দূরত্ব পরিমাপ করতে হবে। এক্ষেত্রে কেন্দ্র থেকে নিরক্ষরেখা বরাবর একটি রেখা কল্পনা করা হয়, যেটি নিরক্ষীয় তল সৃষ্টি করে (চিত্র ২.৩.৩)। উদাহরণস্বরূপ, নিরক্ষীয় তল থেকে উত্তর মেরু বিন্দুর কৌণিক দূরত্ব ৯০°। অতএব, উত্তর মেরুর অক্ষাংশের মান হলো ৯০° উত্তর অক্ষাংশ ।

**দ্রাঘিমা রেখা, দ্রাঘিমাংশ ও গুরুত্বপূর্ণ দ্রাঘিমা রেখা**

ভূ-পৃষ্ঠের কোনো স্থানে মূল মধ্যরেখার সাথে পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দুতে সৃষ্ট কৌণিক দূরত্বকে দ্রাঘিমাংশ বলে। যে কাল্পনিক রেখার মাধ্যমে দ্রাঘিমাংশ প্রকাশ করা হয়, তাকে দ্রাঘিমা রেখা বলে। অর্থাৎ পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরু সংযোগকারী কাল্পনিক রেখাসমূহ দ্রাঘিমা রেখা (Latitude)। প্রতিটি দ্রাঘিমারেখা একেকটি অর্ধবৃত্ত। দ্রাঘিমা রেখাসমূহ পরস্পরের সাথে সমদূরত্বে অবস্থিত নয়, অর্থাৎ মেরুদ্বয়ে এই রেখাগুলো পরস্পরের সর্বাপেক্ষা নিকটে অবস্থান করে এবং নিরক্ষরেখা বরাবর সর্বাপেক্ষা দূরে অবস্থান করে (চিত্র ২.৩.৪)।

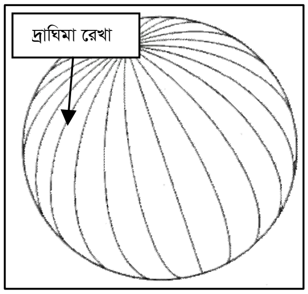


চিত্র ২.৩.৪: অক্ষরেখা সমূহের মধ্যকার দূরত্ব সর্বত্র সমান এবং দ্রাঘিমা রেখা সমূহের মধ্যকার দূরত্ব সর্বত্র সমান নয়

**দ্রাঘিমাংশ নির্ণয় পদ্ধতি :** দ্রাঘিমাংশ নির্ণয় করতে হলে প্রথমে মূল মধ্যরেখা সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। যুক্তরাজ্যের লন্ডন শহরের নিকটবর্তী গ্রীনিচ (Greenwich) নামক স্থানে একটি মান মন্দির বরাবর যে দ্রাঘিমা রেখা অতিক্রম করেছে, তাকে মূল **দ্রাঘিমা রেখা** বা **মূল মধ্যরেখা** বলা হয়। এই মূল মধ্যরেখাটির মান ০° ধরে নেয়া হয় এবং প্রতি **১**° অন্তর অন্তর একটি করে দ্রাঘিমা রেখা কল্পনা করা হয়। মূল মধ্যরেখা বরাবর সমস্ত পৃথিবীকে পূর্ব-পশ্চিমে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়। মূল মধ্যরেখা থেকে পূর্বে মোট ১৮০° পর্যন্ত মোট ১৮০ টি **পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা** কল্পনা করা হয়। অপরদিকে মূল মধ্য রেখা থেকে পশ্চিমে মোট ১৮০° পর্যন্ত মোট ১৮০ টি **পশ্চিম দ্রাঘিমা রেখা** কল্পনা করা হয়। অতএব, পৃথিবী পৃষ্ঠে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত মোট দ্রাঘিমা রেখার সংখ্যা ৩৬০টি। পৃথিবী গোলাকৃতির হওয়ার ১৮০° পূর্ব ও ১৮০° পশ্চিম দ্রাঘিমা রেখা মূলত একই মধ্যরেখার পড়ে। এই ১৮০° দ্রাঘিমা রেখাটি আর্ন্তজাতিক তারিখ রেখা হিসাবে চিহ্নিত।

**দ্রাঘিমা নির্ণয় পদ্ধতি :** দ্রাঘিমা নির্ণয়ের দুইটি পদ্ধতি আছে। যেমন-

**(ক) স্থানীয় সময়ের পার্থক্য দ্বারা :** কোনো স্থানে (**ক স্থান**) মধ্যাহ্নে সূর্য ঠিক মাথার উপরে অবস্থান করলে সময় হবে দুপুর ১২ টা। এক্ষেত্রে, ঐ স্থানের সময়কে ভিত্তি করে প্রতিটি দ্রাঘিমার মধ্যকার দূরত্বকে ৪ মিনিট সময়ের পার্থক্য হিসেব করে দ্রাঘিমা নির্ণয় করা যায়। এই পদ্ধতিতে একটি স্থানের দ্রাঘিমা নির্ণয় করবার পদ্ধতিকে বলা হয় **'স্থানীয় সময়ের পার্থক্য দ্বারা দ্রাঘিমা নির্ণয়' পদ্ধতি** (চিত্র ২.৩.৫)। ধরা যাক, ক ও খ স্থানের মধ্যে সময়ের পার্থক্য ৪ মিনিট। অর্থাৎ ,**ক** স্থানে যখন দুপুর ১২টা, তখন **ক** স্থানের পূর্বদিকে অবস্থিত **খ** স্থানের সময় হবে দুপুর ১২টা ৪ মিনিট। এক্ষেত্রে যদি **ক** স্থানের দ্রাঘিমার মান ১০° পূর্ব ধরে নেয়া হয়, তবে **খ** স্থানের দ্রাঘিমার মান হবে ১১° পূর্ব। **ক** ও **খ** স্থানের মধ্যে স্থানীয় সময়ের পার্থক্য ৪ মিনিট হওয়ায় দ্রাঘিমা রেখাটি মান নির্ণয় করা সম্ভব হলো।

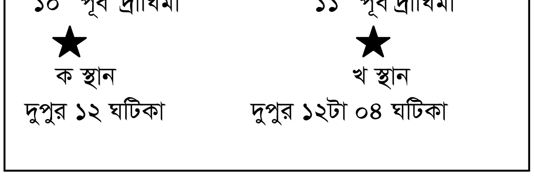


চিত্র ২.৩.৫ : স্থানীয় সময়ের পার্থক্যের দ্বারা দ্রাঘিমা নির্ণয় পদ্ধতি

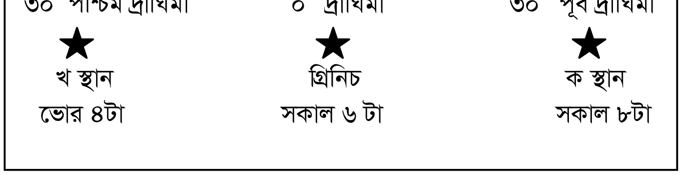


চিত্র ২.৩.৬ : গ্রীনিচ সময়ের পার্থক্যের দ্বারা দ্রাঘিমা নির্ণয় পদ্ধতি

**(খ) গ্রীনিচ সময়ের ভিত্তিতে : গ্রীনিচ** মান মন্দির বরাবর যে কল্পিত দ্রাঘিমা রেখা রয়েছে সেটির মান ($০^\circ$) ধরা হয়। ধরা যাক, গ্রীনিচের সময় সকাল ৬টা হয় ও গ্রীনিচের পূর্বদিকে অপর একটি স্থানের (**ক** স্থান) সময় সকাল ৮টা। এক্ষেত্রে **ক** স্থানের দ্রাঘিমার মান হবে ৩০$^\circ$ পূর্ব দ্রাঘিমা (সকাল ৮টা-সকাল ৬টা =২ ঘন্টা বা ১২০ মিনিট)। আমরা জানি, প্রতি ১$^\circ$ দ্রাঘিমান্তরে ৪ মিনিট সময়ের পার্থক্য হয় এবং গ্রীনিচের পূর্ব দিকে অবস্থিত স্থানগুলোর সময় গ্রীনিচের থেকে এগিয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে,ক স্থানে সকাল ৬টা হলে,খ স্থানে সময় হবে ৮টা। অন্যদিকে, গ্রীনিচের পশ্চিমের স্থানগুলোর সময় গ্রীনিচ থেকে পিছিয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, চিত্র ২.৩.৬-এ **খ** স্থানটির দ্রাঘিমা মান ৩০$^\circ$ পশ্চিম দ্রাঘিমা হলে, উক্ত স্থানের স্থানীয় সময় হবে ভোর ৪টা। এক্ষেত্রে, প্রতি ৪ মিনিট অন্তর ১$^\circ$ দ্রাঘিমান্তর হওয়ায় ১২০ মিনিট সময়ের পার্থক্যে ১২০÷৪=৩০ টি দ্রাঘিমা রেখার পার্থক্য ঘটে। অর্থাৎ, **খ** স্থানটি গ্রীনিচের পশ্চিমে হওয়ায় উক্ত স্থানের সময় হবে ভোর ৪টা।

| | |
|---|---|
| **শিক্ষার্থীর কাজ** | গ্রীনিচ সময়ের ভিত্তিতে ও স্থানীয় সময়ের ভিত্তিতে ঢাকা ও কলকাতার দ্রাঘিমা নির্ণয় করুন। |

## গুরুত্বপূর্ণ দ্রাঘিমা রেখাসমূহ (Important Latitudes and Longitudes)

**নিরক্ষরেখা (Equator) :** পৃথিবীকে উত্তর ও দক্ষিণে সমান দুইটি গোলার্ধে বিভক্তকারী কাল্পনিক অক্ষরেখাটি নিরক্ষরেখা নামে অভিহিত। ভূ-গোলাককে পূর্ব- পশ্চিমে বেষ্টনকারী সর্বাপেক্ষা বৃহৎ অক্ষরেখা নিরক্ষরেখা। নিরক্ষরেখার মান হলো $০^\circ$। এই অক্ষরেখার অপর নাম সমূহ হলো- **বিষুবরেখা (Equator)** ও **মহাবৃত্ত (Great Circle)**। নিরক্ষরেখা বরাবর পৃথিবী আহ্নিক গতির বেগ সর্বাধিক।

**কর্কটক্রান্তি রেখা (Tropic of Cancer) ও মকরক্রান্তি রেখা (Tropic of Capricorn) :** উত্তর গোলার্ধে ২৩.৫$^\circ$ উত্তর অক্ষরেখাকে কর্কটক্রান্তি রেখা ও দক্ষিণ গোলার্ধে ২৩.৫$^\circ$ দক্ষিণ অক্ষরেখাকে **মকরক্রান্তি** রেখা নামে অভিহিত করা হয়। পৃথিবীর আহ্নিক গতি এবং নিজ অক্ষে ২৩.৫$^\circ$ কোণে হেলে অবস্থান করার ফলে সূর্যের কিরণ এই দুই অক্ষরেখা পর্যন্ত লম্বভাবে কিরণ দিয়ে থাকে। ২৩.৫$^\circ$ উত্তর ও ২৩.৫$^\circ$ দক্ষিণ অক্ষরেখার পর সূর্য কিরণ লম্বভাবে পতিত না হয়ে তীর্যক ভাবে পতিত হয় (চিত্র ২.৩.৭)।

চিত্র ২.৩.৭ : পৃথিবী গুরুত্বপূর্ণ অক্ষরেখাসমূহ

**সুমেরুবৃত্ত (Arctic Circle) ও কুমেরুবৃত্ত (Antarctic Circle)**

২১ শে জুন তারিখে সূর্য ২৩.৫$^\circ$ উত্তর অক্ষাংশে (কর্কটক্রান্তি) লম্বভাবে কিরণ দেয়। ঐ দিন উত্তর গোলার্ধে মেরুবিন্দু অর্থাৎ ৯০$^\circ$ উত্তর থেকে ৬৬.৫$^\circ$ উত্তর অক্ষরেখা পর্যন্ত ২৪ ঘন্টা দিন থাকে। এ জন্য ৬৬.৫$^\circ$ উত্তর অক্ষরেখাকে উত্তর মেরু অঞ্চলের শেষ সীমানা ধরা হয় এবং এই অক্ষরেখাকে **সুমেরুবৃত্ত** নামে অভিহিত করা হয়। অপরদিকে ২২ শে ডিসেম্বর তারিখে সূর্য ২৩.৫$^\circ$ দক্ষিণ অক্ষরেখায় (মকরক্রান্তি) লম্বভাবে কিরণ দেয়। উক্ত তারিখে দক্ষিণ মেরু বিন্দু অর্থ্যাৎ ৯০$^\circ$ দক্ষিণ থেকে ৬৬.৫$^\circ$ দক্ষিণ অক্ষরেখা পর্যন্ত ২৪ ঘন্টা দিন থাকে। ফলে ৬৬.৫$^\circ$ দক্ষিণ অক্ষরেখাকে কুমেরু অঞ্চলের শেষ সীমানা ধরা হয় এবং এই অক্ষরেখাকে **কুমেরুবৃত্ত** (Antarctic Circle) নামে অভিহিত করা হয়।

চিত্র ২.৩.৮: পৃথিবীর মূল মধ্যরেখা

**মূল মধ্যরেখা (Prime Meridian) :** মূল মধ্যরেখা প্রকৃতপক্ষে লন্ডনের গ্রীনিচ মানমন্দির বরাবর কল্পিত এক দ্রাঘিমা রেখা। ১৮৮৪ সালে এই দ্রাঘিমা রেখাকে মূলমধ্য রেখা ($০^\circ$ দ্রাঘিমা রেখা) হিসেবে স্থির করে এই রেখার পূর্ব ও পশ্চিমে অন্য দ্রাঘিমা রেখাগুলোর মান নির্ধারণ করা হয় (চিত্র ২.৩.৮)।

| শিক্ষার্থীর কাজ | ভারত ও জাপানের রাজধানী দুইটির দ্রাঘিমা রেখার মান নির্ণয় করুন। |
|---|---|

**সারসংক্ষেপ :**

ভূ-পৃষ্ঠে কোনো একটি স্থানের সঠিক অবস্থান ও সময় নির্ণয়ের উদ্দেশে পৃথিবী পৃষ্ঠে পূর্ব-পশ্চিমে ও উত্তর-দক্ষিণে কতিপয় রেখা কল্পনা করা হয়। পূর্ব-পশ্চিমে বেষ্টনকারী রেখাসমূহ একেকটি পূর্ণবৃত্ত এবং নিরক্ষরেখাটি সর্ববৃহৎ পূর্ণবৃত্ত। নিরক্ষরেখা থেকে উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু বরাবর অক্ষরেখাসমূহের ব্যাস ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে পেতে উভয় মেরুদ্বয়ে বিন্দুতে পরিনত হয়। উত্তর-দক্ষিণে কল্পিত রেখাগুলো একেকটি অর্ধবৃত্ত। লন্ডনের গ্রীনিচ মানমন্দির বরাবর মূল মধ্যরেখার মান ০° ও আর্ন্তজাতিক তারিখ রেখা মান ১৮০°। ২৩.৫° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষরেখা যথাক্রমে কর্কটক্রান্তি ও মকর ক্রান্তি নামে পরিচিত। ৬৬.৫° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষরেখা যথাক্রমে সুমেরু ও কুমেরু বৃত্ত নামে পরিচিত।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৩

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।**

১. পৃথিবীকে উত্তর ও দক্ষিণে সমান দুই গোলার্ধে বিভক্তকারী রেখাটির নাম কী?
ক. কেন্দ্র খ. মেরু
গ. নিরক্ষরেখা ঘ. দ্রাঘিমা রেখা

২. নিরক্ষরেখার সাথে পৃথিবীর কেন্দ্র বিন্দুতে সৃষ্ট কৌণিক দূরত্বকে কী নামে অভিহিত করা হয়?
ক. অক্ষাংশ খ. দ্রাঘিমাংশ
গ. মকরক্রান্তি রেখা ঘ. নিরক্ষরেখা

৩. ১৮০° দ্রাঘিমারেখার অপর নাম কী?
ক. কর্কটক্রান্তি রেখা খ. মকরক্রান্তি রেখা
গ. আর্ন্তজাতিক তারিখ রেখা ঘ. নিরক্ষরেখা

৪. ২৩.৫° উত্তর অক্ষরেখার অপর নাম কী?
ক. কর্কট রেখা খ. মকর রেখা
গ. কুমেরু বৃত্ত ঘ. সুমেরু বৃত্ত

**৫.** গ্রীনিচ মানমন্দির বরাবর কল্পিত দ্রাঘিমা রেখাটি কোনো সালে মূল মধ্যরেখা হিসেবে চিহ্নিত হয়?

ক. ১৬৮৪ খ. ১৭৮৪

গ. ১৮৮৪ ঘ.১৯৮৪

# পাঠ-২.৪ আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা ও সময়
## (International Date Line and Local Time & Standard Time)

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- আর্ন্তজাতিক তারিখ রেখার কী তা জানতে পারবেন;
- আর্ন্তজাতিক তারিখ রেখার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- স্থানীয় সময় ও প্রমাণ সময়ের সংজ্ঞা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং
- পূর্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ন বলতে কী বুঝায় তা জানতে পারবেন।

| মূখ্য শব্দ | আর্ন্তজাতিক তারিখ রেখা, মূল মধ্যরেখা, প্রতিপাদ স্থান, স্থানীয় সময় ও প্রমাণ সময়। |
|---|---|

**আর্ন্তজাতিক তারিখ**

পৃথিবী পৃষ্ঠে কল্পিত ১৮০° দ্রাঘিমা রেখাটি **আর্ন্তজাতিক তারিখ** রেখা নামে পরিচিত। এশিয়া ও উত্তর আমেরিকা মহাদেশের মধ্যভাগ দিয়ে অংকিত এই রেখা স্থলভাগ এড়িয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়ে কল্পনা করা হয়।

**আর্ন্তজাতিক তারিখ রেখার প্রয়োজনীয়তা :** আমরা জানি যে, মূল মধ্যরেখা থেকে পূর্বে বা পশ্চিমে অগ্রসর হলে প্রতিটি দ্রাঘিমার জন্য ৪ মিনিট সময়ের ব্যবধান ঘটে। আবার, মূল মধ্যরেখা থেকে পূর্বে গেলে সময় বাড়ে এবং পশ্চিমে গেলে সময় কমে। এমতাবস্থায়, যদি একটি বিমান মূল মধ্যরেখা থেকে পূর্ব দিকে চলতে চলতে ১৮০° পূর্ব দ্রাঘিমায় পৌছায়, তবে ঐ স্থানের সময় মূল মধ্যরেখা থেকে (১৮০° X ৪ মিনিট = ৭২০ মিনিট) বা ১২ ঘন্টা এগিয়ে থাকবে। অপরদিকে, যদি একটি বিমান মূল মধ্যরেখার পশ্চিমের দিকে চলতে চলতে ১৮০° পশ্চিমে দ্রাঘিমায় পৌছায়, তবে ঐ স্থানের সময় মূল মধ্যরেখার সময় অপেক্ষা ১২ ঘন্টা পিছিয়ে থাকবে।

ধরে নেয়া যাক, মূল মধ্যরেখায় (০°) অর্থাৎ গ্রীনিচ-এ ১৬ ডিসেম্বর-এ স্থানীয় সময় সকাল ৬ ঘটিকা। সেক্ষেত্রে, গ্রীনিচ থেকে ১৬ ডিসেম্বর সকাল ৬ ঘটিকায় রওনা হয়ে একটি বিমান ১৮০° পশ্চিম দ্রাঘিমা রেখায় পৌছলে সেস্থানে সময় হবে আগের দিন, অর্থাৎ ১৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা। আবার, গ্রীনিচ থেকে ১৬ ডিসেম্বর সকাল ৬ ঘটিকায় রওনা হয়ে একটি বিমান ১৮০° পূর্ব দ্রাঘিমা রেখায় পৌছলে, সেখানে সময় হবে ১৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা। আমরা জানি যে, ১৮০° পূর্ব ও পশ্চিম দ্রাঘিমা মূলত একই দ্রাঘিমা রেখা। ফলে একই দ্রাঘিমা রেখায় সময়ের ব্যবধান হয়ে যাচ্ছে ২৪ ঘন্টা এবং তারিখের ক্ষেত্রে দুইটি তারিখ হয়ে যাচ্ছে। তারিখ, সময় ও সাপ্তাহিক দিন নির্ধারনের এই সমস্যা সমাধানের উদেশ্যে ১৮৮৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন-এ 'দ্রাঘিমা ও সময়' সম্পর্কিত এক আর্ন্তজাতিক সম্মেলনে ১৮০° দ্রাঘিমা রেখাকে **'আর্ন্তজাতিক তারিখ রেখা'** হিসাবে স্থির করা হয় (চিত্র ২.৪.১)। এই রেখাটি অতিক্রমের সময়ে পূর্ব দিকে গমনকারী ব্যক্তি যদি সোমবারে রওনা হয়, তবে ১৮০° পূর্ব দ্রাঘিমা অতিক্রম করলে ঘড়ির তারিখ একদিন পিছিয়ে রোববার করতে হবে। আবার, পশ্চিম দিকে গমনকারী ব্যক্তি যদি সোমবারে রওনা হয় তবে ১৮০° পশ্চিম দ্রাঘিমা রেখা অতিক্রম করলে ঘড়ির তারিখ একদিন এগিয়ে মঙ্গলবার করতে হবে। আর্ন্তজাতিক তারিখ রেখাটি প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়ে কল্পনা করা হয় এবং রেখাটি সাইবেরিয়ার উত্তর-পূর্বাংশ এবং এ্যালিউশয়ান, ফিজি ও চ্যাথাম দ্বীপপুঞ্জের স্থলভাগকে এড়িয়ে ১১° পূর্ব দিয়ে বেঁকে এবং বেরিং প্রণালিতে ১২° পূর্ব দিকে বেঁকে কল্পনা করা হয়। আর্ন্তজাতিক তারিখ রেখাটি স্থলভাগের উপর দিয়ে কল্পনা করা হলে স্থানীয় অধিবাসীদের পক্ষে সময়, তারিখ ও বার নির্ধারণে জটিলতা সৃষ্টি হতো।

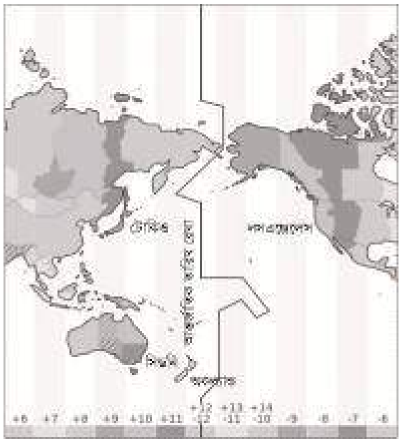

চিত্র ২.৪.১ ঃ আর্ন্তজাতিক তারিখ রেখা

| | |
|---|---|
| **শিক্ষার্থীর কাজ** | মানচিত্রে আর্ন্তজাতিক তারিখ রেখাটি অংকন করুন। |

**প্রতিপাদ স্থান (The Antipodes) :** ভূ-পৃষ্ঠে যে কোনো একটি স্থানের ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত স্থানকে প্রতিপাদ স্থান বলা হয়। অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠের কোনো বিন্দু কল্পিত ব্যাস ভূ-অভ্যন্তরস্থ কেন্দ্রকে ছেদ করে ঠিক উল্টোপাশে যে বিন্দুটিকে স্পর্শ করবে, সেই বিন্দুটিকে প্রথম বিন্দুটির 'প্রতিপাদ স্থান' বলা হয় (চিত্র ২.৪.২)। মনে রাখা প্রয়োজন, প্রথম বিন্দুটি যে দ্রাঘিমায় অবস্থিত হয় ঐ বিন্দুটির প্রতিপাদ স্থান ঠিক তার বিপরীতে ১৮০° দূরত্বের দ্রাঘিমায় অবস্থিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, মূল মধ্যরেখার (০°) প্রতিপাদ স্থান হলো ১৮০° দ্রাঘিমা রেখা। অপরদিকে, কোনো স্থানের প্রতিপাদ স্থানের অক্ষাংশ একই ডিগ্রিতে অবস্থিত হলেও বিপরীত গোলার্ধে অবস্থিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি স্থানের অক্ষাংশ ৪০° উত্তর হলে, এর প্রতিপাদ স্থানের অক্ষাংশ ৪০° দক্ষিণ হবে। ঢাকার প্রতিপাদ স্থান দক্ষিণ আমেরিকার চিলির নিকটে প্রশান্ত মহাসাগরের অবস্থিত (চিত্র ২.৪.২)।

চিত্র ২.৪.২ : প্রতিপাদ স্থান

**স্থানীয় সময় (Local Time) স্থানীয় সময় :** ভূ-পৃষ্ঠে কোনো একটি স্থানের আকাশে সূর্যের অবস্থান দেখে যে সময় গণনা করা হয়, তাকে ঐ স্থানটির স্থানীয় সময় বলে। যেমন- একটি স্থানে সূর্য রশ্মি লম্বভাবে পতিত হলে অর্থাৎ ঠিক মাথা বরাবর যখন অবস্থান করে, তখন ঐ স্থানে দুপুর ১২ ঘটিকা বা মধ্যাহ্ন সময় হয় (চিত্র ২.৪.৩)।

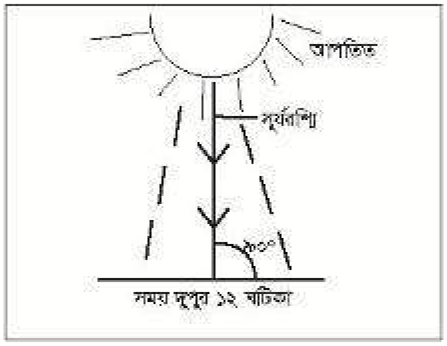


চিত্র ২.৪.৩ : স্থানীয় সময়

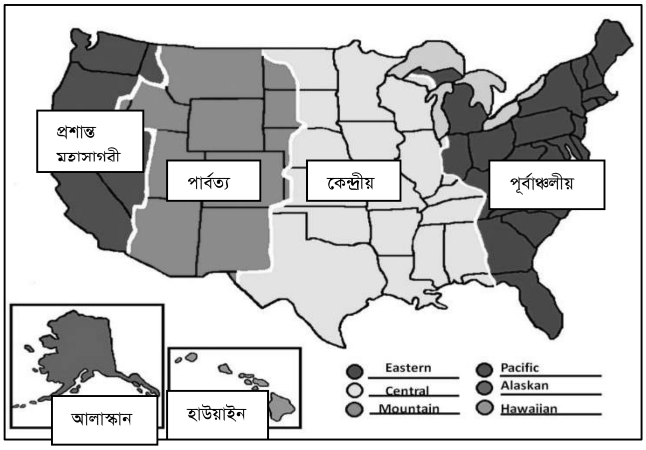


চিত্র ২.৪.৪ : যুক্তরাষ্ট্রের প্রমাণ সময়সমূহ

## প্রমাণ সময় (Standard Time)

একটি দেশে একাধিক দ্রাঘিমা রেখার অবস্থান থাকতে পারে। এমতাবস্থায় একই দেশে একাধিক স্থানীয় সময় গণনা করা হলে,ঐ দেশের অভ্যন্তরীণ সকল প্রকার কর্মকান্ডে বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। আর্ন্তজাতিক অঙ্গনের ঐ দেশের সময় নিয়ে জটিলতা সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই ধরনের সমস্যা দূরীকরণের জন্যে প্রত্যেক দেশের মধ্যবর্তী একটি দ্রাঘিমারেখার স্থানীয় সময়কে ঐ দেশের প্রমাণ সময় হিসেবে গণ্য করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশের প্রমাণ সময় গণনা করা হয় ৯০° পূর্ব দ্রাঘিমাংশের স্থানীয় সময় অনুসারে। এই দ্রাঘিমা রেখাটি (৯০° পূর্ব) ঢাকা বিভাগের অধীনস্থ মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর উপজেলা হারুকান্দি ইউনিয়ন বরাবর কল্পনা করা হয়।

(সূত্রঃ IANA Time Zone database, Eggert, Pail; Olson Arthur David, 2007, Sources for time zone and daylight saving time data, cs.ucla.edu/eggert/tz/tz-link.htm)। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা যায় যে, পূর্ব-পশ্চিমে অধিক বিস্তৃত দেশগুলোর ক্ষেত্রে একাধিক প্রমাণ সময় স্থির করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, যুক্তরাষ্ট্রের মোট চারটি প্রমাণ সময় রয়েছে (চিত্র ২.৪.৪)।

## পূর্বাহ্ন (Ante Meridian), মধ্যাহ্ন (Meridian) ও অপরাহ্ন (Post Meridian)

একটি দিন ২৪ ঘন্টায় আর্বতিত হয়। ইংরেজি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী মধ্যরাত্রি ১২ ঘটিকায় একটি দিনের আরম্ভ হয় এবং ২৪ ঘন্টা পর মধ্যরাত্রি ১২ ঘটিকা পর্যন্ত একটি পূর্ণাঙ্গ দিন গণনা হয়। মধ্যরাত্রি ১২ ঘটিকা থেকে মধ্য দুপুর ১২ ঘটিকা পর্যন্ত

১২ ঘন্টা সময়কাল পূর্বাহ্ন (Ante Meridian/A.M) নামে অভিহিত হয়ে থাকে। মধ্য দুপুর ১২ ঘটিকা সময়কালকে মধ্যাহ্ন (Meridian) এবং মধ্য দুপুর ১২ ঘটিকা থেকে পরবর্তী মধ্যরাত্রি ১২ ঘটিকা পর্যন্ত ১২ ঘন্টা সময়কালকে অপরাহ্ন (Post Meridian/P.M), নামে অভিহিত হয়ে থাকে (চিত্র ২.৪.৫)।

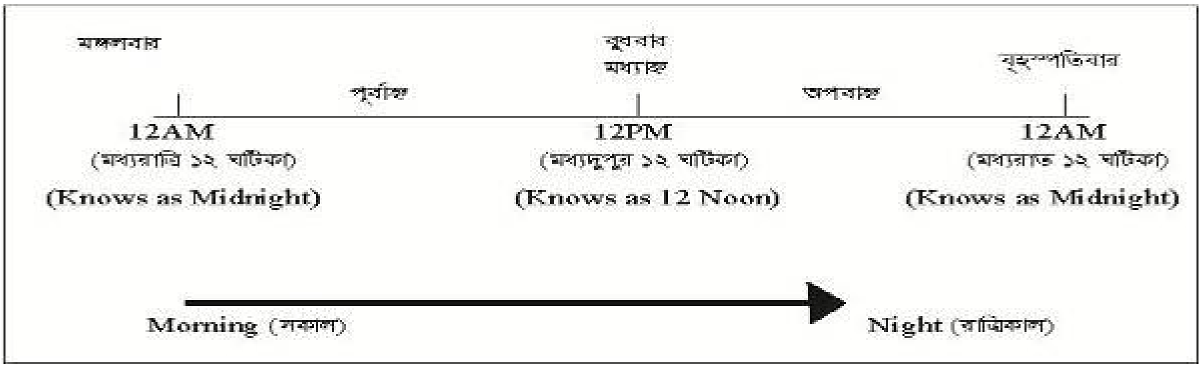


চিত্র ২.৪.৫ : পূর্বাহ্ন, মধ্যহ্ন ও অপরাহ্ন

| | |
|---|---|
| **শিক্ষার্থীর কাজ** | ঢাকা ২৩°৪৩’ উত্তর অক্ষাংশ ও ৯০°২৬’ পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। ঢাকার প্রতিপাদ স্থানের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ নির্ণয় করুন। |

**সারসংক্ষেপ :**

কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানে আকাশে সূর্যের অবস্থান দেখে যে সময় গণনা করা হয়, তাকে স্থানীয় সময় বলা হয়। একটি দেশের মধ্যভাগ বরাবর কল্পিত দ্রাঘিমা রেখায় গণনাকৃত স্থানীয় সময়কে ঐ দেশের সকল অংশের জন্য প্রমাণ সময় হিসেবে গণ্য করা হয়। দিনের মধ্যভাগের পূর্ববর্তী অংশকে পূর্বাহ্ন (A.M), মধ্যভাগকে মধ্যাহ্ন (Meridian) ও পরবর্তী অংশকে অপরাহ্ন (P.M) বলা হয়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৪

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।**

১। প্রতি ১° দ্রাঘিমান্তরে মোট সময়ের পার্থক্য কত?
ক. ৫ মিনিট খ. ৪ মিনিট
গ. ৩ মিনিট ঘ. ২ মিনিট

২। আর্ন্তজাতিক তারিখ রেখাটি কোন মহাসাগর বরাবর কল্পনা করা হয়?
ক. ভারত মহাসাগর খ. উত্তর মহাসাগর
গ. প্রশান্ত মহাসাগর ঘ. আটলান্টিক মহাসাগর

৩। কোনটি দ্রাঘিমা রেখাটি আর্ন্তজাতিক তারিখ রেখা নামে পরিচিত?
ক. ০° দ্রাঘিমা রেখা খ. ১২০° দ্রাঘিমা রেখা
গ. ৯° উত্তর অক্ষরেখা ঘ. ১৮০° দ্রাঘিমা রেখা

৪। একটি বিমান আর্ন্তজাতিক তারিখ রেখা অতিক্রম করে পূর্ব দিকে গেলে সময় কীভাবে পূন:নির্ধারণ করা হবে?
ক. সময় স্থির থাকবে খ. সময় বৃদ্ধি পাবে
গ. সময়হ্রাস পাবে ঘ. সময় একই থাকবে তবে দিন পরিবর্তন হবে

৫। বাংলাদেশের প্রমাণ সময় গণনা করা হয় কত ডিগ্রি দ্রাঘিমাংশে ?
ক. ৬০° পূর্ব দ্রাঘিমাংশে খ. ৯০° পূর্ব দ্রাঘিমাংশে
গ. ৬০° পশ্চিম দ্রাঘিমাংশে ঘ. ৯০° পশ্চিম দ্রাঘিমাংশে

# পাঠ-২.৫ পৃথিবীর গতি : আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি (Motion of the Earth : Diurnal and Annual Motion)

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- আহ্নিক গতির কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে জানতে পারবেন ;
- আহ্নিক গতির প্রমাণসমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- বার্ষিক গতির কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং
- বার্ষিক গতির ফলাফল সম্পর্কে জানতে পারবেন।

| | | |
|---|---|---|
| | **মূখ্য শব্দ** | আহ্নিক গতি, বার্ষিক গতি, দিবারাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি , ঋতু পরিবর্তন। |

**পৃথিবীর আহ্নিক গতি**

পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে নিজ অক্ষে অনবরত পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে আবর্তন করছে। পৃথিবীর এই আবর্তনকে **আহ্নিক গতি বা দৈনিক গতি** বলা হয়। নিজ অক্ষে একবার ঘুরতে পৃথিবীর মোট ২৩ ঘন্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেন্ড বা ২৪ ঘন্টা সময় প্রয়োজন। এই সময়কে **সৌরদিন** বলা হয় (চিত্র ২.৫.১)।

পৃথিবী গোলাকার হলেও এর ব্যাস সর্বত্র সমান নয়। নিরক্ষরেখা বরাবর পৃথিবীর ব্যাস সর্বাপেক্ষা বেশি হওয়ায় এই অঞ্চলে পৃথিবীর আহ্নিক গতির বেগও সর্বাপেক্ষা বেশি (ঘন্টা প্রতি ১৭০০ কি.মি. প্রায়)। এই গতিবেগ মেরুদ্বয়ের দিকে ক্রমশ কমে আসতে থাকে এবং ৯০° উত্তর ও ৯০° দক্ষিণ মেরুবিন্দু দ্বয়ে প্রায় স্তিমিত হয়ে যায়। ঢাকায় আহ্নিক গতির বেগ প্রায় ১৬০০ কিঃমিঃ/ঘন্টা। পৃথিবীর আবর্তন গতি থাকা সত্ত্বেও নিম্নোক্ত কতিপয় কারণে পৃথিবী পৃষ্ঠে বসবাসরত মানুষ ঐ আবর্তন অনুভব করে না এবং ছিটকে পড়ে না।

ক. পৃথিবীর আয়তনের তুলনায় ভূ-পৃষ্ঠে বসবাসরত জীবজগতের সকল প্রাণি ও মানুষ এত বেশি ক্ষুদ্রাকার যে পৃথিবীর ঘূর্ণন অনুভব করতে পারে না।

খ. পৃথিবী পৃষ্ঠে অবস্থিত সকল জৈব ও অজৈব পদার্থ মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে ভূ-পৃষ্ঠে আটকে আছে। ফলে, আমরা পৃথিবী থেকে ছিটকে পড়ি না।

গ. মহাবিশ্বে সকল গ্রহ-উপগ্রহ ও পৃথিবী একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে এবং নির্দিষ্ট গতিতে অনবরত আবর্তিত হচ্ছে। ফলে পৃথিবীর যে কোনো স্থান থেকে মহাকাশে দৃষ্টিপাত করলে প্রায় একই চিত্র দৃষ্টিগোচর হয়। এ কারণে পৃথিবীর নিজ অক্ষে আবর্তনের বিষয়টি অনুধাবন করা সম্ভব হয় না।

**পৃথিবীর আহ্নিক গতির প্রমাণসমূহ (Proves of Diurnal Rotation)**

পৃথিবী যে নিজ অক্ষে প্রতি ২৪ ঘন্টায় একবার আবর্তিত হচ্ছে তার প্রমাণসমূহ নিম্নরূপ-

ক. পৃথিবী থেকে মহাকাশে প্রেরিত মহাকাশ যান ও উপগ্রহসমূহ থেকে প্রাপ্ত ছবিসমূহ পৃথিবীর নিজ অক্ষে পশ্চিম থেকে পূর্বে আবর্তনের প্রমাণ দেয়।

খ. পৃথিবীর আকৃতি গোলাকার হলেও উভয় মেরুতে কিছুটা চাপা ও নিরক্ষরেখা বরাবর কিছুটা স্ফীত। বিজ্ঞানী নিউটন এর মতানুসারে, জন্মলগ্নে প্রায় অর্ধগলিত ও নমনীয় পৃথিবী নিজ অক্ষে লাটিমের মত ঘুরতে ঘুরতে একই সঙ্গে কেন্দ্রমুখী (Centripetal) ও কেন্দ্রবিমুখী (Centrifugal) শক্তির প্রভাবে এরূপ আকার ধারণ করেছে।

গ. পৃথিবী নিজ অক্ষে আবর্তিত হবার ফলে ভূ-পৃষ্ঠের কোনো একটি স্থানে দিন ও রাত্রি উভয়ই সংঘটিত হয়। উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের সুমেরু বৃত্ত ও কুমেরু বৃত্তের অভ্যন্তরীন অঞ্চল ব্যতীত ভূপৃষ্ঠের সর্বত্র প্রায় ১২ ঘন্টা রাত ও ১২ ঘন্টা দিন হয়ে থাকে। অতএব, ভূ-পৃষ্ঠের একটি স্থানের দিবা রাত্রির সংঘটন আহ্নিক গতির ফলেই হয়ে থাকে।

ঘ. ফেরেলের কোরিওলিস এফেক্ট বা প্রভাব সূত্রানুযায়ী নিজ অক্ষে আবর্তনের ফলে বায়ুপ্রবাহ ও সমুদ্রস্রোত উত্তর গোলার্ধে ডান দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে বেঁকে প্রবাহিত হয়। ফলে বায়ুপ্রবাহ ও সমুদ্রস্রোত উচ্চচাপ থেকে নিম্নচাপের দিকে প্রবাহিত না হয়ে সামান্য বেঁকে যায় (চিত্র-২.৫.২)।

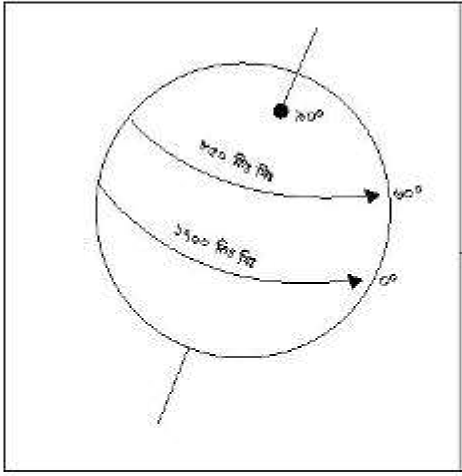


চিত্র ২.৫.১ : পৃথিবীর আহ্নিক গতি

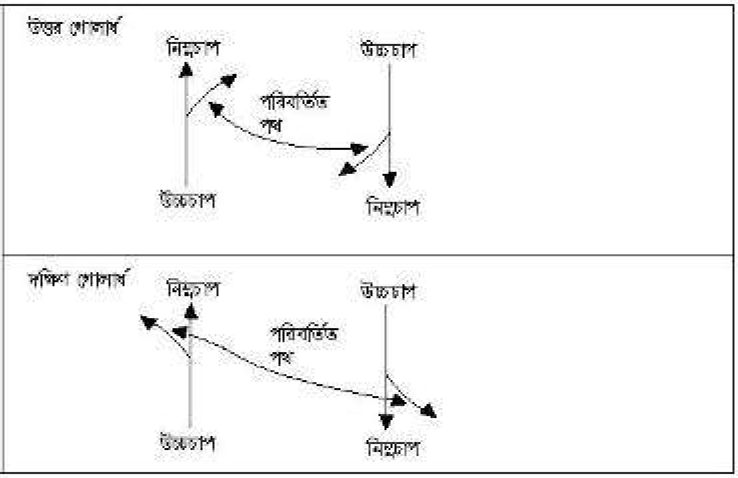


চিত্র ২.৫.২ : ফেরেলের কোরিওলিস সূত্রানুসারে সমুদ্রস্রোত ও বায়ু প্রবাহের দিক পরিবর্তন

## পৃথিবীতে আহ্নিক গতির ফলাফল (Resultants of Diurnal Motion on Earth)

আহ্নিক গতির ফলে পৃথিবীতে বেশ কিছু কর্মকান্ড সংঘটিত হয়ে থাকে। এগুলো হলো-

**১। দিবা-রাত্রির সংঘটন :** গোলাকার পৃথিবীর নিজস্ব কোনো আলো নেই বলে সূর্যের আলোকে পৃথিবী পৃষ্ঠ আলোকিত হয়ে থাকে। পৃথিবী স্থির থাকলে এর যে পার্শ্ব সূর্যের দিকে অবস্থান করতো কেবল সে অংশই আলোকিত হতো অর্থাৎ দিন হতো। অপর পার্শ্বে কোনো আলো না থাকায় ঐ অংশ অন্ধকারাছন্ন থাকতো  অর্থাৎ রাত্রি হতো। বাস্তবে পৃথিবীর সর্বত্র ক্রমানুসারে দিন ও রাত্রি সংঘটিত হয়ে থাকে। পৃথিবীর আহ্নিক গতির কারণে এইরূপ দিবারাত্রি সংঘটিত হয়ে থাকে (চিত্র ২.৫.৩)।

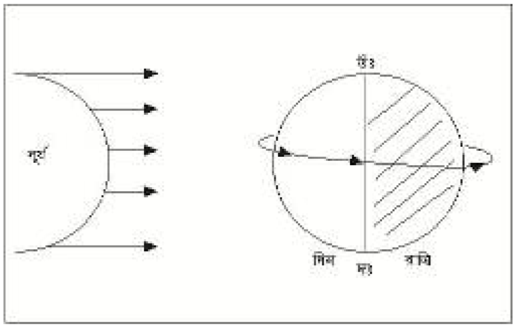


চিত্র ২.৫.৩ঃ দিবা-রাত্রির সংঘটন ও তাপমাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধি

**২। জোয়ার-ভাঁটার সৃষ্টি :** আহ্নিক গতির কারণে ভূ-পৃষ্ঠে কোনো একটি স্থানে প্রতিদিন দুইবার জোয়ার ও  দুইবার ভাঁটা সংঘটিত হয়। তবে পৃথিবী নিজ অক্ষে অনবরত ঘূর্ণনশীল হওয়ায় আহ্নিক গতির ফলে একটি স্থানের প্রতিদিন একই সময়ে জোয়ার ভাঁটা সংঘটিত না হয়ে ৫২ মিনিট সময়ের ব্যবধানে সংঘটিত হয়।

**৩। বায়ুপ্রবাহ ও সমুদ্রস্রোতের সৃষ্টি:**  পৃথিবীর আকার অভিগত গোলকের ন্যায়। ফলে নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে মেরুপ্রদেশের দিকে পৃথিবীর অক্ষরেখাসমূহের ব্যাস ও আর্বতনের গতিবেগ ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে। ফেরেলের কোরিওলিস এফেক্ট সূত্রানুযায়ী, আহ্নিক গতির কারণে বায়ুপ্রবাহ ও সমুদ্রস্রোত উত্তর গোলার্ধে ডানদিকে ও দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে বেঁকে যায় (চিত্র ২.৫.২)।

**৪। তাপমাত্রার তারতম্য সৃষ্টি :** আহ্নিক গতির কারণে ভূ-পৃষ্ঠের যে কোনো একটি স্থান প্রায় ১২ ঘন্টা সূর্যের দিকে অবস্থান করে। ফলে দিনের বেলায় সূর্য রশ্মির তাপে ঐ স্থানটির বায়ু ও মাটি উত্তপ্ত হয়ে পড়ে। আবার, পৃথিবীর নিজ অক্ষে ঘূর্ণনের কারণে ঐ স্থানটি ক্রমশ সূর্য হতে দূরে সরে যেতে থাকে এবং রাত্রির আর্বিভাব হয় এবং সূর্য হতে দূরে অবস্থান করায় তাপমাত্রা ক্রমশঃ কমতে থাকে। এভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ দিবসে (২৪ ঘন্টা সময়কালে) একই স্থানে দিন ও রাত্রি সৃষ্টি হওয়ার ফলে তাপমাত্রার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে থাকে (চিত্র ২.৫.৩)।

**৫। জীবজগতের সৃষ্টি ও বংশ বিস্তার :** জীবজগতের সৃষ্টি ও টিকে থাকবার জন্যে ভূ-পৃষ্ঠে প্রতিটি স্থানে নির্দিষ্ট তাপমাত্রা, বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদি জলবায়ুর উপাদানের প্রয়োজন। এ সকল জলবায়ুর উপাদানের পরিমাণের তারতম্যের ভিত্তিতে ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ, জীবজন্তু ও মানব সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়েছে। আহ্নিক গতির ফলে সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী দিন রাত্রির সংঘটন ও তাপমাত্রার তারতম্যের ফলেই গোটা জীবজগত সৃষ্টি ও বংশ বিস্তার করে থাকে।

## পৃথিবীর বার্ষিক গতি (Annual Motion or Revolution of the Earth)

পৃথিবী নিজ অক্ষে আবর্তিত হতে হতে সূর্যের মহাকর্ষ শক্তির আকর্ষণে একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে (সূর্যকে পরিক্রমনের পথ) নির্দিষ্ট সময়ে সূর্যের চারিদিকে আবর্তিত হতে থাকে। পৃথিবীর এইরূপ গতিকে **বার্ষিক গতি** বা **পরিক্রমণ গতি** বলা হয়। সূর্যের চারিদিকে একবার পূর্ণ পরিক্রমন বা আবর্তনের জন্যে পৃথিবীর মোট সময় প্রয়োজন ৩৬৫ দিন ৫ ঘন্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড। একে **সৌরবছর** (Solar Year) বলে। ইংরেজী ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ৩৬৫ দিনে এক **সৌর বছর** গণনা করা হয়। প্রতি বছর অতিরিক্ত ৫ ঘন্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড সময় কালকে প্রতি চার বছর অন্তর ১ দিন বা ২৪ ঘন্টা হিসেবে ঐ বছরের ফেব্রুয়ারী মাসকে ২৮ দিনের বদলে ২৯ দিন হিসেবে গণনা করা হয়। এই বছরটি **অধিবর্ষ (Leap Year)** নামে অভিহিত। মনে রাখা প্রয়োজন, কোনো একটি বছরের সংখ্যাগত নম্বরটিকে ৪ দিয়ে ভাগ করলে যদি কোনো ভাগ শেষ না থাকে, তবে ঐ বছরটি হবে লিপ ইয়ার। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৬ কে ৪ দিয়ে ভাগ করলে কোনো ভাগশেষ থাকে না (২০১৬ ÷ ৪ = ৫০৪) অর্থাৎ ঐ বছরটি হবে একটি অধিবর্ষ। ঐ বছরে ফেব্রুয়ারী মাস ২৮ দিনের বদলে ২৯ দিনে গণনা করা হবে।

| | |
|---|---|
| **শিক্ষার্থীর কাজ** | ২০১৪ থেকে ২০৩৪ সাল পর্যন্ত সময়কালে কোনো কোনো বছর অধিবর্ষ (Leap Year) নির্ণয় করুন। |

## পৃথিবীর বার্ষিক গতির ফলাফল (Resultants of the Annual Motion or Revolution of the Earth)

পৃথিবী বার্ষিক গতির ফলাফল প্রধানত দুইটি। যথা:

(ক) দিবা-রাত্রির দৈর্ঘ্যের হ্রাস-বৃদ্ধি (Fluctuation of Length of the Day & Night)

(খ) ঋতু পরিবর্তন (Change of Seasons)

### (ক) দিবা-রাত্রির দৈর্ঘ্যের হ্রাসবৃদ্ধি

প্রধানত পাঁচটি কারণে পৃথিবী পৃষ্ঠে দিবা-রাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। অর্থাৎ একটি দিবসে দিন ও রাত্রির সময়কাল সকল সময়ে এক হয় না। নিম্নোক্ত কারণে এইরূপ হয়ে থাকে। যেমন:

ক. পৃথিবীর আকার অভিগত গোলকের ন্যায়;

খ. সূর্যকে প্রদক্ষিণ করার পথটি, অর্থাৎ কক্ষপথটি উপবৃত্তাকার (Elliptical);

গ. পৃথিবীর দুইটি গতি যেমন: আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি;

ঘ. পৃথিবী আপন কক্ষপথে (Orbit) ৬৬.৫° কোণে হেলে অবস্থানরত এবং

ঙ. পৃথিবী নিজ অক্ষে (Axis) ২৩.৫° কোণে হেলে অবস্থানরত (চিত্র ২.৫.৪)।

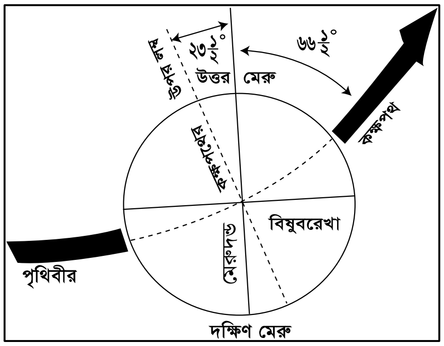


চিত্র ২.৫.৪: পৃথিবী নিজ অক্ষে ও কক্ষপথেহেলে অবস্থানরত

### দিবা-রাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি (Fluctuation of the Length of the day) এবং ঋতু পরিবর্তন (Seasonal Change)

চিত্র ২.৫.৫ : পৃথিবীর নিজ অক্ষে এবং কক্ষপথে কৌণিক অবস্থান

এবারে আসুন আলোচনা করা যাক, উপরোক্ত পাঁচটি কারণ কী উপায়ে দিবা-রাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি এবং ঋতু পরিবর্তন সংঘটিত করে। সূর্যকে পরিক্রমনকালে পৃথিবী নিজ মেরু অক্ষকে কক্ষপথের সাথে ২৩.৫° কোণে হেলে রাখে। পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করার সময়ে ২১শে মার্চ নিক্ষরেখার (০°) বরাবর লম্বভাবে কিরণ দেয়।

এরপর ক্রমশ আবর্তন করতে করতে ২১ শে জুন পৃথিবী সূর্যের সাথে এমন এক অবস্থানে আসে, যেখানে ভূ-পৃষ্ঠে ২৩.৫° উত্তর অক্ষাংশ অর্থাৎ কর্কটক্রান্তি রেখা বরাবর সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয় (চিত্র ২.৫.৫)। ফলে এই সময়ে সূর্য উত্তর গোলার্ধের দিকে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকে থাকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধ থেকে সবচেয়ে বেশি দূরত্বে থাকে। অতএব উত্তর গোলার্ধে সূর্য ও পৃথিবীর নিকটতম দূরত্বে থাকায়, ২১ শে জুন তারিখে উত্তর গোলার্ধে সর্বাপেক্ষা বড় দিন (১৪ ঘন্টা) ও সর্বাপেক্ষা ছোট (১০ ঘন্টা) রাত হয়ে থাকে। সূর্যের এই অবস্থানকে সূর্যের উত্তরায়ন বলে।

সূর্য উত্তর গোলার্ধে ২৩.৫° উত্তর অক্ষরেখা বা কর্কটক্রান্তি রেখা পর্যন্ত লম্বভাবে কিরণ দিতে পারে। অতএব ২১ শে জুন ২৩.৫° উত্তর অক্ষরেখায় সূর্যের উত্তরায়ণকে কর্কট সংক্রান্তি বলা হয় (চিত্র ২.৫.৬)। ২১শে জুনের পর পৃথিবীর আবর্তনের অর্থাৎ বার্ষিক আবর্তনের ফলে সূর্যের অবস্থান ক্রমশঃ নীচের দিকে সরে আসতে থাকে। ২৩ শে সেপ্টেম্বর সূর্য নিরক্ষরেখায় লম্বভাবে কিরণ দেয়। ২১শে মার্চ ও ২৩শে সেপ্টেম্বর সূর্যরশ্মি পৃথিবীর ঠিক মধ্যভাগ বরাবর কিরণ দেয় বলে ঐ দুইটি দিন সর্বত্র দিন ও রাত্রি সমান থাকে। ২৩শে সেপ্টেম্বর এর পর থেকে বার্ষিক গতির কারণে সূর্যের অবস্থান ক্রমশঃ দক্ষিণ গোলার্ধের দিকে আসতে থাকে। ২২শে ডিসেম্বর দক্ষিণ গোলার্ধে ২৩.৫° দক্ষিণ অক্ষাংশ অর্থাৎ মকর ক্রান্তি রেখা বরাবর লম্বভাবে কিরণ দেয়। দক্ষিণ গোলার্ধে লম্বভাবে সূর্য কিরণ পতিত হবার এই প্রক্রিয়াকে সূর্যের **দক্ষিণায়ন** বলে। দক্ষিণায়নের প্রক্রিয়াটি মকরসংক্রান্তি নামে অভিহিত। সূর্যকে কেন্দ্র করে প্রায় ৩৬৫ দিন বা ১ সৌর বছরে পৃথিবী তার নির্দিষ্ট কক্ষপথে একবার পরিক্রমণ করে। ডিম্বাকৃতির কক্ষপথে পরিভ্রমনকালে ৪ জুলাই পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যকার এই দূরত্ব সর্বাপেক্ষা বেশী থাকে (১৫২.১ মিলিয়ন কি.মি.)। একে পৃথিবীর 'অপসূর' (Aphelion) বলা হয়। ৩ জানুয়ারী পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যকার এই দূরত্ব সর্বাপেক্ষা কম থাকে (১৪৭.১ মিলিয়ন কি.মি.) যাকে পৃথিবীর 'অনুসুর' (Perihelion) অবস্থান বলা হয় (চিত্র ২.৫.৭)।

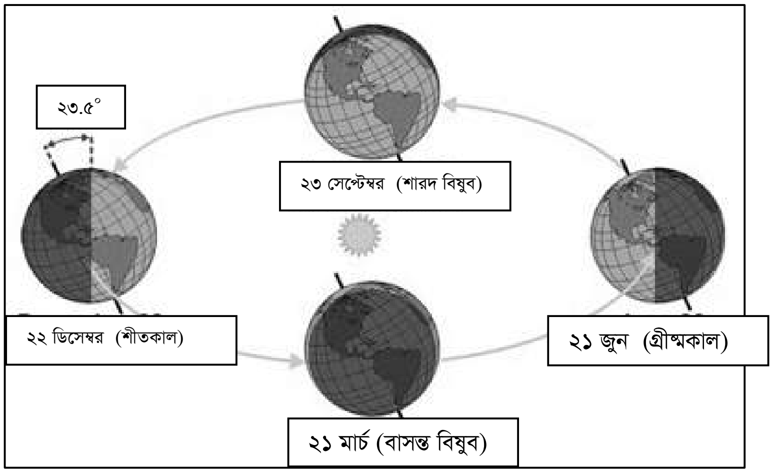

চিত্র ২.৫.৬ঃ পৃথিবীর বার্ষিক গতির ফলে দিবা-রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি ও ঋতু পরিবর্তন

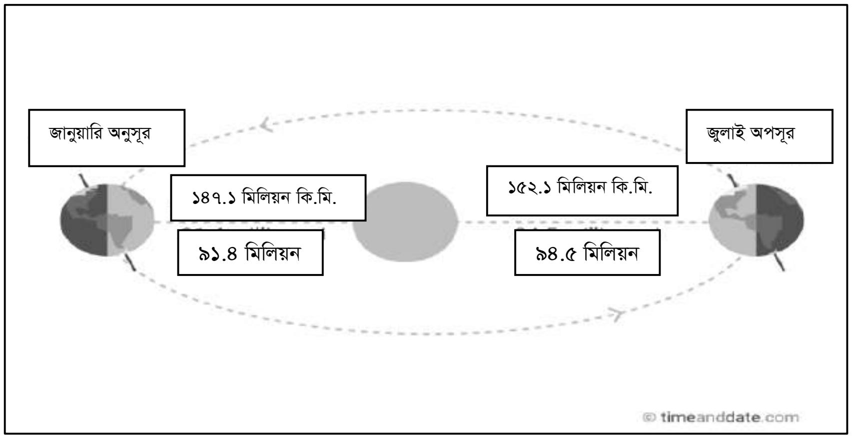

চিত্র ২.৫.৭ : পৃথিবীর অনুসূর ও অপসূর

**বাসন্ত বিষুব (Vernal Equinox) ও শারদ বিষুব (Autumnal Equinox)** : ২১শে মার্চ ও ২৩শে সেপ্টেম্বর সূর্য নিরক্ষরেখার (০°) উপর লম্বভাবে কিরণ দেয় বলে এই দুই দিন পৃথিবীর সর্বত্র দিন রাত্রির দৈর্ঘ্য সমান হয়। একে **বিষুব** (Equinox) বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ২১শে মার্চ উত্তর গোলার্ধে বসন্তকাল থাকায় এই উত্তর গোলার্ধে বিষুব **'বাসন্ত বিষুব'** (Vernal Spring Equinox) নামে অভিহিত। অপরদিকে ২৩শে সেপ্টেম্বর উত্তর গোলার্ধে শরৎকাল বিরাজ করায় উত্তর গোলার্ধে এই বিষুব **'শারদ বিষুব'** (Autumnal Equinox) নামে অভিহিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, বাসন্ত বিষুব ও **শারদ বিষুব** উভয় গোলার্ধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। একটি গোলার্ধে বিষুব অবস্থা চলাকালীন যে ঋতু বিরাজ করে, উক্ত ঋতু অনুসারে ঐ গোলার্ধে বাসন্ত বা শারদ বিষুব হয়।

**ঋতু পরিবর্তন পদ্ধতি (The Season Change System)** : ভূ-পৃষ্ঠে কোনো একটি অঞ্চলে দিবা-রাত্রির দৈর্ঘ্যের ভিত্তিতে ও ঐ স্থানে সূর্য রশ্মির পতন কোণের পার্থক্যের জন্য, অর্থাৎ সূর্য রশ্মি লম্বভাবে অথবা তীর্যক ভাবে পতিত হবার উপর নির্ভর করে নির্দিষ্ট অঞ্চলটিতে সারা বছর ব্যাপী তাপমাত্রার পার্থক্য ঘটে। সূর্যের এই তাপমাত্রার তারতম্য অনুসারে সমগ্র বৎসরকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেকটি ভাগকে একেকটি ঋতু নামে অভিহিত করা হয়। সমগ্র বিশ্বে মোট চারটি ঋতু পরিলক্ষিত হয়। পৃথিবীর চারটি অবস্থান পর্যালোচনা করলে ঋতু পরিবর্তনের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

**উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল ও দক্ষিণ গোলার্ধে শীতকাল :** আমরা জানি, ২১শে মার্চের সূর্য নিরক্ষরেখার উপর লম্বভাবে কিরণ দেয়। এরপর পৃথিবী নিজ কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে ২১শে জুন তারিখে এমন অবস্থানে আসে যে, ঐ দিন উত্তর গোলার্ধে ২৩.৫° উত্তর অক্ষাংশ বরাবর সূর্য রশ্মি লম্বভাবে পতিত হয়। এ সময়ে উত্তর গোলার্ধ সূর্যের দিকে হেলে থাকায় দীর্ঘ দিবাভাগ ও অপেক্ষাকৃত কম দীর্ঘ রাত্রি সংঘটিত হয়। এ সময়ে সূর্যের কিরণ দীর্ঘ সময় যাবৎ ভূ-পৃষ্ঠ ও তৎসংলগ্ন বায়ুস্তরকে অত্যন্ত উত্তপ্ত করে তোলে। ফলে এপ্রিল মাসের প্রথম ভাগ থেকে জুন মাসের শেষ ভাগ পর্যন্ত উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল বিরাজ করে। অপরদিকে দক্ষিণ গোলার্ধ সূর্য থেকে অধিক দূরত্বে অবস্থান করায় সে সময়ে ঐ গোলার্ধে শীতকাল বিরাজ করে (চিত্র ২.৫.৭)।

| | |
|---|---|
| উত্তর গোলার্ধে লম্ব রশ্মির পতনের ফলে গ্রীষ্মকাল। দক্ষিণ গোলার্ধে তীর্যক রশ্মির পতনের ফলে শীতকাল। | দক্ষিণ গোলার্ধে লম্ব রশ্মির পতনের ফলে গ্রীষ্মকাল। উত্তর গোলার্ধে তীর্যক রশ্মির পতনের ফলে শীতকাল। |

**উত্তর গোলার্ধে শরৎকাল ও দক্ষিণ গোলার্ধে বসন্তকাল :** ২১শে জুনের পর থেকে পৃথিবীর বার্ষিক গতির কারণে দক্ষিণ মেরু সূর্যের নিকটবর্তী হতে থাকে। ২৩শে সেপ্টেম্বর সূর্য রশ্মি নিরক্ষরেখা (০°) বরাবর লম্বভাবে কিরণ দেয়। এই দিন মেরুদেশীয় অঞ্চল ব্যতীত সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠে দিন ও রাত্রি সমান হয়ে থাকে। এ সময়কালে অর্থাৎ জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগ পর্যন্ত উত্তর গোলার্ধে শরৎকাল ও দক্ষিণ গোলার্ধে বসন্তকাল বিরাজ করে। শরৎ ও বসন্ত উভয় ঋতুতে তাপমাত্রার তীব্রতা মাঝামাঝি পর্যায়ে থাকে বলে আরামপ্রদ আবহাওয়া থাকে।

**উত্তর গোলার্ধে শীতকাল ও দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল :** ২৩শে সেপ্টেম্বরের পর থেকে দক্ষিণ গোলার্ধে সূর্যের কৌণিক দূরত্ব ক্রমশঃ কমতে থাকে। অপর দিকে, উত্তর গোলার্ধের সাথে সূর্যের দূরত্ব বেড়ে যায়। ফলে, উত্তর গোলার্ধে সূর্যরশ্মি তীর্যকভাবে ও অপেক্ষাকৃত স্বল্প সময়ের জন্য পতিত হয়। দক্ষিণ গোলার্ধে বিপরীত অবস্থা, অর্থাৎ দীর্ঘ দিবাভাগ ও স্বল্প দৈর্ঘ্যের রাত্রি বিরাজ করে। ২২শে ডিসেম্বর পৃথিবী এমন অবস্থানে আসে যে ২৩.৫° দক্ষিণ অক্ষাংশ, অর্থাৎ মকরক্রান্তি রেখার উপর সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয়। ঐ দিন দক্ষিণ গোলার্ধে সর্বাপেক্ষা বড় দিবাভাগ ও সর্বাপেক্ষা ছোট রাত্রি বিরাজ করে। উত্তর গোলার্ধের সাথে সূর্যের দূরত্ব সর্বাপেক্ষা বেশি হওয়ায় ঐ দিন উত্তর গোলার্ধে দিন সবচেয়ে ছোট ও রাত্রি সবচেয়ে বড় হয়। অতএব, ঐ সময়কালে, অর্থাৎ, অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাসে উত্তর গোলার্ধে শীতকাল এবং দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল বিরাজ করে (চিত্র ২.৫.৭)।

**উত্তর গোলার্ধে বসন্তকাল ও দক্ষিণ গোলার্ধে শরৎকাল :** পৃথিবী ২২শে ডিসেম্বরের পর নিজ কক্ষপথে অগ্রসর হতে হতে ২১শে মার্চ এমন অবস্থানে পৌঁছায় যখন সূর্য রশ্মি নিরক্ষরেখা বরাবর লম্বভাবে পতিত হয়। ২১শে মার্চ পৃথিবীর সর্বত্র দিনরাত্রি সমান হয়। এই সময়কালে অর্থাৎ জানুয়ারী থেকে মার্চ মাসে উত্তর গোলার্ধে বসন্তকাল ও দক্ষিণ গোলার্ধে শরৎকাল বিরাজ করে।

### বিশ্বময় ঋতু পরিবর্তনের প্রভাব (Global Effect of Season Change)

- ঋতু পরিবর্তনের ফলে মানুষের সকল ধরনের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃকিত কর্মকান্ডে বিভিন্নতা দেখা যায়।
- ঋতু পরিবর্তনের ফলে বিশ্বময় উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ সম্পদের বিভিন্নতা ঘটে থাকে।
- ঋতু পরিবর্তনের সময়ে বিশ্বব্যাপী নানা ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় সংঘটিত হয়ে থাকে। যেমন- ঝড়, বৃষ্টি, তুষারপাত ইত্যাদি।

| | |
|---|---|
| **শিক্ষার্থীর কাজ** | সূর্যকে পরিক্রমকালে পৃথিবীর চারটি অবস্থানের ভিত্তিতে উত্তর গোলার্ধের ঋতু পরিবর্তনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ছক আকারে প্রদর্শন করুন। |

**সারসংক্ষেপ :**

পৃথিবী নিজ অক্ষে ২৩.৫° কোণ সৃষ্টি করে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে অনবরত আবর্তিত হচ্ছে। আহ্নিক গতির ফলে দিবা-রাত্রির সংঘটন, বায়ুপ্রবাহ ও সমুদ্রস্রোত সৃষ্টি ও দিবাভাগে তাপমাত্রার তারতম্য ঘটে থাকে। ডিম্বাকৃতির কক্ষপথে পরিভ্রমনকালে ৪ জুলাই পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যকার এই দূরত্ব সর্বাপেক্ষা বেশি থাকে (১৫২ মিলিয়ন কি.মি.)। একে পৃথিবীর অপসূর (Aphelion) বলা হয়। ৩রা জানুয়ারি পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যকার এই দূরত্ব সর্বাপেক্ষা কম থাকে (১৪৭.১ মিলিয়ন কি.মি.) যাকে পৃথিবীর 'অনুসুর' (Perihelion) অবস্থান বলা হয়। বার্ষিক গতির ফলে দিবা-রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি ও ঋতু পরিবর্তন সংঘটিত হয়ে থাকে। প্রতি চার বছর অন্তর ফেব্রুয়ারী মাস ২৯ দিনে গণনা করা হয়, যা অধিবর্ষ (Leap Year) নামে অভিহিত হয়ে থাকে।

**পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৫**

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।**

১. আহ্নিক গতির বেগ কোনো অক্ষাংশে সর্বাপেক্ষা বেশি?
   ক. নিরক্ষরেখায় খ. কর্কটক্রান্তি রেখায়
   গ. মেরু প্রদেশে ঘ. সুমেরু বিন্দুতে

২. আহ্নিক গতির কারণে বায়ুপ্রবাহ ও সমুদ্রস্রোত দক্ষিণ গোলার্ধে কোনো দিকে বেঁকে প্রবাহিত হয়?
   ক. বামদিকে খ. ডান দিকে
   গ. উত্তর দিকে ঘ. দক্ষিণ দিকে

৩. পৃথিবী তার কক্ষপথে কত ডিগ্রি হেলে থেকে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে?
   ক. ২২.৫° খ. ২৩.৫°
   গ. ২৪.৫° ঘ. ২৫.৫°

৪. ২১ শে মার্চ দিন-রাত্রির দৈর্ঘ্য সমান হওয়ায় উত্তর গোলার্ধে কোনো ঋতু বিরাজ করে ?
   ক. গ্রীষ্মকাল খ. বর্ষাকাল
   গ. শরৎ কাল ঘ. বসন্ত কাল

৫. সূর্য কোনো তারিখে ২৩.৫° উত্তর অক্ষাংশ বরাবর লম্বভাবে কিরণ দেয়?
   ক. ২১শে মার্চ খ. ২১শে জুন
   গ. ২৩শে সেপ্টেম্বর ঘ. ২০শে ডিসেম্বর

**চূড়ান্ত মূল্যায়ন**

**সৃজনশীল প্রশ্ন-১**

১। পৃথিবী নিজ অক্ষে আবর্তিত হতে হতে সূর্যের মহাকর্ষ শক্তির আকর্ষণে একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে (সূর্যকে পরিক্রমনের পথ), নির্দিষ্ট সময়ে সূর্যের চারিদিকে আবর্তিত হতে থাকে। পৃথিবীর এইরূপ গতিকে **বার্ষিক গতি** বা **পরিক্রমন গতি** বলা হয়। সূর্যের চারিদিকে একবার পূর্ণ পরিক্রমন বা আবর্তনের জন্যে পৃথিবীর মোট সময় প্রয়োজন ৩৬৫ দিন ৫ ঘন্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড। একে **সৌরবছর** (Solar Year) বলে। ইংরেজি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ৩৬৫ দিনে এক **সৌর বছর** গণনা করা হয়। প্রতি বছর অতিরিক্ত ৫ ঘন্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড সময় কালকে প্রতি চার বছর অন্তর ১ দিন বা ২৪ ঘন্টা হিসেবে ঐ বছরের ফেব্রুয়ারি মাসকে ২৮ দিনের বদলে ২৯ দিন হিসেবে গণনা করা হয়। এই বছরটি **অধিবর্ষ (Leap Year)** নামে অভিহিত।

ক. পৃথিবীর আহ্নিক গতি বলতে কী বুঝায়?
খ. পৃথিবীর বার্ষিক গতির ফলে কোনো ধরনের পরিবর্তন হয়?
গ. লিপ ইয়ার বা অধিবর্ষ কেন গণনা করা হয়?
ঘ. পৃথিবীর কক্ষপথটি ডিম্বাকৃতির হওয়ায় পৃথিবী ও সূর্যের দূরত্ব সর্বদা এক থাকে না। এর ফলে কী কী বিশেষ অবস্থা পরিলক্ষিত হয়।

### ১ নং প্রশ্নের নমুনা উত্তর

**ক.** পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে নিজ অক্ষে অনবরত পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে আবর্তন করছে। পৃথিবীর এই আবর্তনকে **আহ্নিক গতি** বলা হয়।

খ. পৃথিবী বার্ষিক গতির ফলে দুই ধরনের পরিবর্তন হয়। যথা:

- দিবা-রাত্রির দৈর্ঘ্যের হ্রাস-বৃদ্ধি
- ঋতু পরিবর্তন

গ. সাধারনত ৩৬৫ দিনে এক **সৌর বছর** গণনা করা হলেও প্রতি বছর অতিরিক্ত ৫ ঘন্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড সময় কালকে প্রতি চার বছর অন্তর ১ দিন বা ২৪ ঘন্টা হিসেবে ধরা হয়। ঐ বছরের ফেব্রুয়ারী মাসকে ২৮ দিনের বদলে ২৯ দিন হিসেবে গণনা করা হয়। এই বছরটি **অধিবর্ষ (Leap Year)** নামে অভিহিত। মনে রাখা প্রয়োজন, কোনো একটি বছরের সংখ্যাগত নম্বরটিকে ৪ দিয়ে ভাগ করলে যদি কোনো ভাগ শেষ না থাকে, তবে ঐ বছরটি হবে লিপ ইয়ার।

ঘ. পৃথিবীর কক্ষপথটি ডিম্বাকৃতির হওয়ায় পৃথিবী ও সূর্যের দূরত্ব সর্বদা এক থাকে না। এর ফলে ডিম্বাকৃতির কক্ষপথে পরিভ্রমনকালে ৪ জুলাই পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যকার এই দূরত্ব সর্বাপেক্ষা বেশি থাকে (১৫২ মিলিয়ন কি.মি.)। একে পৃথিবীর অপসূর (Aphelion) বলা হয়। ৩রা জানুয়ারী পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যকার এই দূরত্ব সর্বাপেক্ষা কম থাকে (১৪৭ মিলিয়ন কি.মি.) যাকে পৃথিবীর 'অনুসুর' (Perihelion) অবস্থান বলা হয়। সূর্যের সাথে পৃথিবীর দূরত্বের এই তারতম্যের ফলে ঋতু পরিবর্তন সংঘটিত হয়।

## উপরের সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তরের আলোকে নিম্নের সৃজনশীল প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখার চর্চা করুন।

### সৃজনশীল প্রশ্ন : ২

আশিক একটি বিমানে লন্ডন এর গ্রীনিচ থেকে সকাল ৬ ঘটিকায় পূর্ব দিকে রওনা হয়ে ৯০° পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা বরাবর পৌঁছালেন। উক্ত স্থানের দ্রাঘিমা রেখার মান অনুযায়ী আশিক তাঁর ঘড়ির সময় নির্ধারন কওে নিলেন।

১। প্রতিটি দ্রাঘিমান্তরে মোট কত সময়ের পার্থক্য ঘটে?

২। দ্রাঘিমান্তরে মূলমধ্যরেখার পূর্ব বা পশ্চিম গেলে কি উপায়ে সময় নির্ধারণ করা হয়?

৩। আশিক তাঁর ঘড়িতে কোনো সময়টি ঠিক করে নিলেন?

(ক) সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা (খ) ভোর রাত ৪ ঘটিকা

(গ) সকাল ৮ ঘটিকা (ঘ) বেলা ১২ ঘটিকা

৪। আশিক দ্রাঘিমান্তরে সময় ও দিনের পার্থক্য নির্ধারণ করলেন কেন?

## উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১ : ১. গ ২.ঘ ৩.ক ৪.ঘ ৫.ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.২ ঃ ১.খ ২.গ ৩.গ ৪.ঘ ৫.ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৩ ঃ ১.গ ২.ক ৩.গ ৪.ক ৫.গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৪ ঃ ১.খ ২.গ ৩.ঘ ৪.খ ৫.খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৫ ঃ ১.ক ২.ক ৩.খ ৪.ঘ ৫.খ